বিলাসী

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রাপ্তিস্থান:
কামিনী প্রকাশালয়
১১৫ অখিল মিস্ত্রি লেন
কলিকাতা-৯

প্রকাশক ঃ
শ্রীশ্যামাপদ সরকার
১১৫ অখিল মিস্ত্রি লেন
কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ ঃ
শুভ রথযাত্রা ১[illegible]৬৫

মুদ্রক ঃ
জয়ন্ত প্রিণ্টার্স
অর্চনা ঘোষ
৯/এ হরিপাল লেন
কলিকাতা-৬

বিলাসী

পাকা দুই ক্রোশ পথ হাঁটিয়া স্কুলে বিদ্যা অর্জন করিতে যাই। আমি একা নই—দশ-বারোজন। যাহাদেরই বাটী পল্লীগ্রামে, তাহাদের শতকরা আশি জনকে এমনি করিয়া বিদ্যালাভ করিতে হয়। ইহাতে লাভের অঙ্কে শেষ পর্যন্ত একেবারে শূন্য না পড়িলেও, যাহা পড়ে, তাহার হিসাব করিবার পক্ষে এই কয়টা কথা চিন্তা করিয়া দেখিলেই যথেষ্ট হইবে যে, যে ছেলেদের সকাল আটটার মধ্যে বাহির হইয়া যাতায়াতে চার ক্রোশ পথ ভাঙ্গিতে হয়—চার ক্রোশ মানে আট মাইল নয়, ঢের বেশী—বর্ষার দিনে মাথার উপর মেঘের জল ও পায়ের নীচে একহাঁটু কাদা এবং গ্রীষ্মের দিনে জলের বদলে কড়া সূর্য এবং কাদার বদলে ধূলার সাগর সাঁতার দিয়া স্কুল-ঘর করিতে হয়, সে দুর্ভাগা বালকদের মা-সরস্বতী খুশী হইয়া বর দিবেন কি, তাহাদের যন্ত্রণা দেখিয়া কোথায় যে তিনি মুখ লুকাইবেন, ভাবিয়া পান না।

তার পরে এই কৃতবিদ্য শিশুর দল বড় হইয়া একদিন গ্রামেই বসুন, আর ক্ষুধার জ্বালায় অন্যত্রই যান—তাঁদের চার-ক্রোশ হাঁটা বিদ্যার তেজ আত্মপ্রকাশ করিবেই করিবে। কেহ কেহ বলেন শুনিয়াছি, আচ্ছা, যাদের ক্ষুধার জ্বালা, তাদের কথা না হয় নাই ধরিলাম, কিন্তু যাঁদের সে জ্বালা নাই, তেমন সব ভদ্রলোকই বা কি গ্রাম ছাড়িয়া পলায়ন করেন? তাঁরা বাস করিতে থাকিলে ত পল্লীর এত দুর্দশা হয় না!

ম্যালেরিয়ার কথাটা না হয় নাই পাড়িলাম। সে যাক, কিন্তু ঐ চার ক্রোশ হাঁটার জ্বালায় কত ভদ্রলোকেই যে ছেলেপুলে লইয়া গ্রাম ছাড়িয়া শহরে পালান তাহার আর সংখ্যা নাই। তার পরে একদিন ছেলেপুলের-পড়াও শেষ হয় বটে, তখন কিন্তু শহরের সুখ-সুবিধা রুচি লইয়া আর তাঁদের গ্রামে ফিরিয়া আসা চলে না।

কিন্তু থাক এ-সকল বাজে কথা। ইস্কুলে যাই—দু'ক্রোশের মধ্যে এমন আরও ত দু'তিনখানা গ্রাম পার হইতে হয়। কার বাগানে আম পাকিতে শুরু করিয়াছে, কোন্ বনে বঁইচি ফল অপর্যাপ্ত ফলিয়াছে, কার গাছে কাঁঠাল এই পাকিল বলিয়া, কার মর্তমান রম্ভার কাঁদি কাটিয়া লইবার অপেক্ষা মাত্র, কার কানাচে ঝোপের মধ্যে আনারসের গায়ে রঙ ধরিয়াছে, কার পুকুর-পাড়ের খেজুর-মেতি কাটিয়া লইলে ধরা পড়িবার সম্ভাবনা অল্প, এইসব খবর লইতেই সময় যায়, কিন্তু আসল যা বিদ্যা—কামস্কট্কার রাজধানীর নাম কি, এবং সাইবিরিয়ার খনির মধ্যে রূপা মেলে, না সোনা মেলে—এ-সকল দরকারী তথ্য অবগত হইবার ফুরসতই মেলে না।

কাজেই এক্‌জামিনের সময় এডেন কি জিজ্ঞাসা করিলে বলি পারসিয়ার বন্দর, আর হুমায়ুনের বাপের নাম জানিতে চাহিলে লিখিয়া দিয়া আসি তোগ্‌লক খাঁ।—এবং আজ চল্লিশের কোঠা পার হইয়াও দেখি, ও-সকল বিষয়ে ধারণা প্রায় একরকমই আছে—তার পরে প্রোমশনের দিন মুখ ভার করিয়া বাড়ি ফিরিয়া আসিয়া কখনো বা দল বাঁধিয়া মতলব করি, মাস্টারকে ঠ্যাঙানো উচিত, কখনো বা ঠিক করি, অমন বিশ্রী স্কুল ছাড়িয়া দেওয়া কর্তব্য।

আমাদের গ্রামের একটি ছেলের সঙ্গে মাঝে মাঝেই ইস্কুলের পথে দেখা হইত। তার নাম ছিল মৃত্যুঞ্জয়। আমাদের চেয়ে সে বয়সে অনেক বড়। থার্ড ক্লাসে পড়িত। কবে যে সে প্রথম থার্ড

ক্লাসে উঠিয়াছিল, এ খবর আমরা কেহই জানিতাম না—সম্ভবতঃ তাহা প্রত্নতাত্ত্বিকের গবেষণার বিষয়—আমরা কিন্তু তাহার ঐ থার্ড ক্লাশটাই চিরদিন দেখিয়া আসিয়াছি।

তাহার ফোর্থ ক্লাশে পড়ার ইতিহাসও কখনো শুনি নাই, সেকেণ্ড ক্লাসে উঠার খবরও কখনো পাই নাই। মৃত্যুঞ্জয়ের বাপ-মা ভাই-বোন কেহই ছিল না; ছিল শুধ্ গ্রামের একপ্রান্তে একটা প্রকাণ্ড আম-কাঁঠালের বাগান, আর তার মধ্যে একটা পোড়ো-বাড়ি, আর ছিল এক জ্ঞাতি খুড়ো। খুড়োর কাজ ছিল ভাইপোর নানাবিধ দুর্নাম রটনা করা—সে গাঁজা খায়, সে গুলি খায়, এমনি আরও কত কি! তাঁর আর একটা কাজ ছিল বলিয়া বেড়ানো,—ঐ বাগানের অর্ধেকটা তাঁর নিজের অংশ, নালিশ করিয়া দখল করার অপেক্ষা মাত্র। অবশ্য দখল একদিন তিনি পাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু সে জেলা-আদালতে নালিশ করিয়া নয়—উপরের আদালতের হুকুমে। কিন্তু সে কথা পরে হইবে।

মৃত্যুঞ্জয় নিজে রাঁধিয়া খাইত এবং আমের দিনে ঐ আম-বাগানটা জমা দিয়াই তাহার সারা বৎসরের খাওয়া-পরা চলিত এবং ভাল করিয়াই চলিত। যেদিন দেখা হইয়াছে, সেই দিনই দেখিয়াছি মৃত্যুঞ্জয় ছেঁড়া-খোঁড়া মলিন বইগুলি বগলে করিয়া পথের এক ধার দিয়া নীরবে চলিয়াছে। তাহাকে কখনো কাহারও সহিত যাচিয়া আলাপ করিতে দেখি নাই—বরঞ্চ উপযাচক হইয়া কথা কহিতাম আমরাই। তাহার প্রধান কারণ ছিল এই যে, দোকানের খাবার কিনিয়া খাওয়াইতে গ্রামের মধ্যে তাহার জোড়া ছিল না। আর শুধু ছেলেরাই নয়। কত ছেলের বাপ কতবার যে গোপনে ছেলেকে দিয়া তাহার কাছে স্কুলের মাহিনা হারাইয়া গেছে, বই চুরি গেছে ইত্যাদি বলিয়া টাকা আদায় করিয়া লইত তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু ঋণ স্বীকার করা ত দূরের কথা, ছেলে তাহার

সহিত একটা কথা কহিয়াছে এ-কথা কোন বাপ ভদ্র-সমাজে কবুল করিতে চাহিত না—গ্রামের মধ্যে মৃত্যুঞ্জয়ের ছিল এমনি সুনাম।

অনেকদিন মৃত্যুঞ্জয়ের সহিত দেখা নাই। একদিন শোনা গেল সে মর-মর। আর একদিন শোনা গেল, মালপাড়ার এক বুড়া মাল তাহার চিকিৎসা করিয়া এবং তাহার মেয়ে বিলাসী সেবা করিয়া মৃত্যুঞ্জয়কে যমের মুখ হইতে এ-যাত্রা ফিরাইয়া আনিয়াছে।

অনেকদিন তাহার অনেক মিষ্টান্নের সদ্ব্যয় করিয়াছি—মনটা কেমন করিতে লাগিল. একদিন সন্ধ্যার অন্ধকারে লুকাইয়া তাহাকে দেখিতে গেলাম। তাহার পোড়োবাড়িতে প্রাচীরের বালাই নাই। স্বচ্ছন্দে ভিতরে ঢুকিয়া দেখি, ঘরের দরজা খোলা. বেশ উজ্জ্বল একটি প্রদীপ জ্বলিতেছে, আর ঠিক সুমুখেই তক্তপোশের উপর পরিষ্কার ধপধপে বিছানায় মৃত্যুঞ্জয় শুইয়া আছে, তাহার কঙ্কালসার দেহের প্রতি চাহিলেই বুঝা যায়, বাস্তবিক যমরাজ চেষ্টার ত্রুটি কিছু করেন নাই, তবে যে শেষ পর্য্যন্ত সুবিধা করিয়া উঠিতে পারেন নাই, সে কেবল ওই মেয়েটির জোরে। সে শিয়রে বসিয়া পাখার বাতাস করিতেছিল, অকস্মাৎ মানুষ দেখিয়া চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। এ সেই বুড়া সাপুড়ে মেয়ে বিলাসী। তাহার বয়স আঠারো কি আঠাশ ঠাহর করিতে পারিলাম না। কিন্তু মুখের প্রতি চাহিবা-মাত্রই টের পাইলাম, বয়স যাই হোক, খাটিয়া খাটিয়া আর রাত জাগিয়া জাগিয়া ইহার শরীরে আর কিছু নাই। ঠিক যেন ফুলদানিতে জল দিয়া ভিজাইয়া রাখা বাসী ফুলের মত। হাত দিয়া এতটুকু স্পর্শ করিলে এতটুকু নাড়াচাড়া করিতে গেলেই ঝরিয়া পড়িবে।

মৃত্যুঞ্জয় আমাকে চিনিতে পারিয়া বলিল. কে, ন্যাড়া?

বলিলাম, হুঁ।

মৃত্যুঞ্জয় কহিল, ব'লো!

মেয়েটা ঘাড় হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মৃত্যুঞ্জয় দুই-চারিটা কথায় যাহা কহিল, তাহার মর্ম এই যে, প্রায় দেড়মাস হইতে চলিল সে শয্যাগত। মধ্যে দশ-পনেরো দিন সে অজ্ঞান অচৈতন্য অবস্থায় পড়িয়াছিল, এই কয়েকদিন হইল সে লোক চিনিতে পারিতেছে এবং যদিও এখনো সে বিছানা ছাড়িয়া উঠিতে পারে না, কিন্তু আর ভয় নাই।

ভয় নাই থাকুক। কিন্তু ছেলেমানুষ হইলেও এটা বুঝিলাম, আজও যাহার শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিবার ক্ষমতা হয় নাই, সেই রোগীকে এই বনের মধ্যে একাকী যে মেয়েটি বাঁচাইয়া তুলিবার ভার লইয়াছিল, সে কতবড় গুরুভার। দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি তাহার কত সেবা, কত শুশ্রূষা, কত ধৈর্য্য, কত রাত-জাগা! সে কত বড় সাহসের কাজ! কিন্তু যে বস্তুটি এই অসাধ্য-সাধন করিয়া তুলিয়াছিল তাহার পরিচয় যদিচ সেদিন পাই নাই, কিন্তু আর একদিন পাইয়াছিলাম।

ফিরিবার সময় মেয়েটি আর একটি প্রদীপ লইয়া আমার আগে আগে ভাঙ্গা প্রাচীরের শেষ পর্যন্ত আসিল। এতক্ষণ পর্যন্ত সে একটি কথাও কহে নাই, এইবার আস্তে আস্তে বলিল, রাস্তা পর্যন্ত তোমায় রেখে আসব কি?

বড় বড় আমগাছ সমস্ত বাগানটা যেন একটা জমাট অন্ধকারের মত বোধ হইতেছিল, পথ দেখা ত দূরে কথা, নিজের হাতটা পর্যন্ত দেখা যায় না। বলিলাম, পৌঁছে দিতে হবে না, শুধু আলোটা দাও।

সে প্রদীপটা আমার হাতে দিতেই তাহার উৎকণ্ঠিত মুখের চেহারাটা আমার চোখে পড়িল। আস্তে আস্তে সে বলিল, একলা যেতে ভয় করবে না ত? একটু এগিয়ে দিয়ে আসব?

মেয়েমানুষ জিজ্ঞাসা করে, ভয় করবে না ত? সুতরাং মনে যাই থাক, প্রত্যুত্তরে শুধু একটা 'না' বলিয়াই অগ্রসর হইয়া গেলাম।

সে পুনরায় কহিল, বন-জঙ্গলের পথ, একটু দেখে দেখে পা ফেলে যেয়ো।

সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়া উঠিল, কিন্তু এতক্ষণে বুঝিলাম উদ্বেগটা তাহার কিসের জন্য এই কেন সে আলো দেখাইয়া এই বনের পথটা পার করিয়া দিতে চাহিতেছিল। হয়ত সে নিষেধ শুনিত না, সঙ্গেই যাইত, কিন্তু পীড়িত মৃত্যুঞ্জয়কে একাকী ফেলিয়া যাইতেই বোধ করি তাহার শেষ পর্যন্ত মন সরিল না।

কুড়ি-পঁচিশ বিঘার বাগান। সুতরাং পথটা কম নয়! এই দারুণ অন্ধকারের মধ্যে প্রত্যেক পদক্ষেপই বোধ করি ভয় ভয় করিতে হইত, কিন্তু পরক্ষণেই মেয়েটির কথাতেই সমস্ত মন এমনি আচ্ছন্ন হইয়া রহিল যে, ভয় পাইবার আর সময় পাইলাম না। কেবল মনে হইতে লাগিল, একটা মৃতকল্প রোগী হইয়া থাকা কত কঠিন! মৃত্যুঞ্জয় ত যে কোন মুহূর্তেই মরিতে পারিত, তখন সমস্ত রাত্রি এই বনের মধ্যে মেয়েটি একাকী কি করিত! কেমন করিয়া তাহার সে রাতটা কাটিত!

এই প্রসঙ্গে অনেকদিন পরের একটা কথা আমার মনে পড়ে। এক আত্মীয়ের মৃত্যুকালে আমি উপস্থিত ছিলাম। অন্ধকার রাত্রি—বাটীতে ছেলেপুলে চাকর-বাকর নাই, ঘরের মধ্যে শুধু তাঁর সদ্য বিধবা স্ত্রী, আর আমি! তাঁর স্ত্রী ত শোকের আবেগে দাপাদাপি করিয়া এমন কাণ্ড করিয়া তুলিলেন যে, ভয় হইল তাঁহারও প্রাণটা বুঝি বাহির হইয়া যায় বা। কাঁদিয়া কাঁদিয়া বার বার আমাকে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, তিনি স্বেচ্ছায় যখন সহমরণে যাইতে চাহিতেছেন, তখন সরকারের কি? তাঁর যে আর তিলার্ধ বাঁচিতে সাধ নাই, এ কি তাহারা বুঝিবে না? তাহাদের ঘরে কি স্ত্রী নাই? তাহারা কি পাষাণ? আর এই রাত্রেই গ্রামের পাঁচজনে যদি নদীর তীরের কোন একটা জঙ্গলের মধ্যে তাঁর সহমরণের যোগাড় করিয়া

দেয় ত পুলিশের লোক জানিবে কি করিয়া ? এমনি কত কি। কিন্তু আমার ত আর বসিয়া বসিয়া তাঁর কান্না শুনিলেই চলে না। পাড়ায় খবর দেওয়া চাই—অনেক জিনিস যোগাড় করা চাই কিন্তু আমার বাহিরে যাইবার প্রস্তাব শুনিয়াই তিনি প্রকৃতিস্থ হইয়া উঠিলেন। চোখ মুছিয়া বলিলেন, ভাই, যা হবার সে ত হইয়াছে, আর বাইরে গিয়ে কি হইবে ? রাতটা কাট্‌ক না।

বলিলাম, অনেক কাজ, না গেলেই যে নয়।

তিনি বলিলেন, হোক কাজ, তুমি ব'সো।

বললাম, বসলে চলবে না, একবার খবর দিতেই হইবে, বলিয়া পা বাড়াইবামাত্রই তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন, ওরে বাপ্‌রে! আমি একলা থাকতে পারব না।

কাজেই আবার বসিয়া পড়িতে হইল। কারণ, তখন বুঝিলাম, যে-স্বামী জ্যান্ত থাকিতে তিনি নির্ভয়ে পঁচিশ বৎসর একাকী ঘর করিয়াছেন, তাঁর মৃত্যুটা যদি বা সহে, তাঁর মৃতদেহটা এই অন্ধকার রাত্রে পাঁচ মিনিটের জন্যেও স্ত্রীর সহিবে না। বুক যদি কিছুতে ফাটে ত সে এই মৃত স্বামীর কাছে একলা থাকিলে।

কিন্তু দুঃখটা তাঁহার তুচ্ছ করিয়া দেখানও আমার উদ্দেশ্য নহে। কিংবা তাহা খাঁটি নয় এ কথা বলাও আমার অভিপ্রায় নহে। কিংবা একজনের ব্যবহারেই তাহার চূড়ান্ত মীমাংসা হইয়া গেল তাহাও নহে। কিন্তু এমন আরও অনেক ঘটনা জানি, যাহার উল্লেখ না করিয়াও আমি এই কথা বলিতে চাই যে, শুধু কর্তব্য-জ্ঞানের জোরে অথবা বহুকাল ধরিয়া একসঙ্গে ঘর করার অধিকারেই এই ভয়টাকে কোন মেয়েমানুষই অতিক্রম করিতে পারে না। ইহা আর একটা শক্তি যাহা বহু স্বামী-স্ত্রী এক শ' বৎসর একত্রে ঘর করার পরেও হয়ত তাহার কোন সন্ধানই পায় না।

কিন্তু সহসা সেই শক্তির পরিচয় যখন কোন নরনারীর কাছে

পাওয়া যায়, তখন সমাজের আদালতে আসামী করিয়া তাহাদের দণ্ড দেওয়ায় আবশ্যক যদি হয় ত হোক, কিন্তু মানুষের যে বস্তুটি সামাজিক নয়, সে নিজে ইহাদের দুঃখে গোপনে অশ্রু বিসর্জন না করিয়া কোন মতেই থাকিতে পারে না।

প্রায় মাস-দুই মৃত্যুঞ্জয়ের খবর লই নাই। যাঁহারা পল্লীগ্রাম দেখেন নাই, কিংবা ওই রেলগাড়ির জানালায় মুখ বাড়াইয়া দেখিয়াছেন, তাঁহারা হয়ত সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিবেন, এ কেমন কথা? এ কি কখনো সম্ভব হইতে পারে যে অত-বড় অসুখটা চোখে দেখিয়া আসিয়াও মাস-দুই আর তার খবরই নাই? তাঁহাদের অবগতির জন্য বলা আবশ্যক যে, শুধু সম্ভব নয়, এই হইয়া থাকে। একজনের বিপদে পাড়াসুদ্ধ ঝাঁক বাঁধিয়া উপুড় হইয়া পড়ে, এই যে একটা জনশ্রুতি আছে, জানি না তাহা সত্যযুগের পল্লীগ্রামের ছিল কি না, কিন্তু একালে ত কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে করিতে পারি না। তবে তাহার মরার খবর যখন পাওয়া যায় নাই, তখন যে সে বাঁচিয়া আছে, এ ঠিক।

এমনি সময়ে হঠাৎ একদিন কানে গেল, মৃত্যুঞ্জয়ের সেই বাগানের অংশীদার খুড়া তোলপাড় করিয়া বেড়াইতেছে যে, গেল— গেল, গ্রামটা এবার রসাতলে গেল! নালতের মিত্তির বলিয়া সমাজে আর তাঁর মুখ বাহির করবার জো রহিল না—অকাল-কুষ্মাণ্ডটা একটা সাপুড়ের মেয়ে নিকা করিয়া ঘরে আনিয়াছে। আর শুধ্ নিকা নয়, তাও না হয় চুলায় যাক, তাহার হাতে ভাত পর্যন্ত খাইতেছে! গ্রামে যদি ইহার শাসন না থাকে ত বনে গিয়া বাস করিলেই ত হয়! কোড়োলা, হরিপুরের সমাজ এ কথা শুনিলে যে—ইত্যাদি ইত্যাদি।

তখন ছেলে বুড়ো সকলের মুখেই ঐ এক কথা,—অ্যাঁ—এ হইল কি? কলি কি সত্যই উল্‌টাইতে বসিল!

খুড়া বলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, এ যে ঘটিবে, তিনি অনেক আগেই জানিতেন। তিনি শুধু তামাসা দেখিতেছিলেন; কোথাকার জল কোথায় গিয়া মরে! নইলে পর নয়, প্রতিবেশী নয়, আপনার ভাইপো! তিনি কি বাড়ি লইয়া যাইতে পারিতেন না? তাঁহার কি ডাক্তার-বৈদ্য দেখাইবার ক্ষমতা ছিল না? তবে কেন যে করেন নাই, এখন দেখুক সবাই। কিন্তু আর ত চুপ করিয়া থাকা যায় না! এ যে মিত্তির বংশের নাম ডুবিয়া যায়! গ্রামের যে মুখ পোড়ে।

তখন আমরা গ্রামের লোক মিলিয়া যে কাজটা করিলাম, তাহা মনে করিলে আমি আজিও লজ্জায় মরিয়া যাই। খুড়া চলিলেন নালতের মিত্তির-বংশের অভিভাবক হইয়া, আর আমরা দশ-বারোজন সঙ্গে চলিলাম গ্রামের বদন দগ্ধ না হয় এইজন্য।

মৃত্যুঞ্জয়ের পোড়ো-বাড়িতে গিয়া যখন উপস্থিত হইলাম তখন সবেমাত্র সন্ধ্যা হইয়াছে। মেয়েটি ভাঙ্গা বারান্দার একধারে রুটি গড়িতেছিল, অকস্মাৎ লাঠিসোঁটা হাতে এতগুলি লোককে উঠানের উপর দেখিয়া ভয়ে নীলবর্ণ হইয়া গেল।

খুড়ো ঘরের মধ্যে উঁকি মারিয়া দেখিলেন, মৃত্যুঞ্জয় শুইয়া আছে। চট করিয়া শিকলটা টানিয়া দিয়া সেই ভয়ে মৃতপ্রায় মেয়েটিকে সম্ভাষণ শুরু করিলেন। বলা বাহুল্য জগতের কোন খুড়া কোনকালে বোধ করি ভাইপোর স্ত্রীকে ওরূপ সম্ভাষণ করে নাই। সে এমনটি যে, মেয়েটি হীন সাপুড়ের মেয়ে হইয়াও তাহা সহিতে পারিল না, চোখ তুলিয়া বলিল, বাবা আমারে বাবুর সাথে নিকে দিয়েছে জানো!

খুড়া বলিলেন, তবে রে! ইত্যাদি ইত্যাদি! এবং সঙ্গে সঙ্গেই দশ-বারোজন বীরদর্পে হুঙ্কার দিয়া তাহার ঘাড়ে পড়িল। কেহ

ধরিল চুলের মুটি, কেহ ধরিল কান, কেহ ধরিল হাত-ত্নটো—এবং যাদের সে সুযোগ ঘটিল না, তাহারাও নিচেষ্ট হইয়া রহিল না।

কারণ সংগ্রাম-স্থলে আমরা কাপুরুষের ন্যায় চুপ করিয়া থাকিতে পারি, আমাদের বিরুদ্ধে এত বড় ত্নর্নাম রটনা করিতে বোধ করি নারায়ণের কর্তৃপক্ষেরও চক্ষুলজ্জা হইবে।

এইখানে একটা অবান্তর কথা বলিয়া রাখি। শুনিয়াছি নাকি বিলাত প্রভৃতি ম্লেচ্ছ দেশে পুরুষদের মধ্যে একটা কুসংস্কার আছে, স্ত্রীলোক ত্নর্বল এবং নিরুপায় বলিয়া তাহার গায়ে হাত তুলিতে নাই। এ আবার একটা কি কথা! সনাতন হিন্দু এ কুসংস্কার মানে না। আমরা বলি, যাহারই গায়ে জোর নাই, তাহারই গায়ে হাত তুলিতে পারা যায়। তা সে নর নারী যাই হোক না কেন।

মেয়েটি প্রথমেই সেই যা একবার আর্তনাদ করিয়া উঠিয়াছিল, তারপরে একেবারে চুপ করিয়া গেল। কিন্তু আমরা যখন তাহাকে গ্রামের বাহিরে রাখিয়া আসিবার জন্য হিঁচড়াইয়া লইয়া চলিলাম, তখন সে মিনতি করিয়া বলিতে লাগিল, বাবুরা, আমাকে একটিবার ছেড়ে দাও, আমি রুটিগুলো ঘরে দিয়ে আসি। বাইরে শিয়াল কুকুরে খেয়ে যাবে—রোগা মানুষ সমস্ত রাত খেতে পাবে না।

মৃত্যুঞ্জয় রুদ্ধ ঘরের মধ্যে পাগলের মত মাথা কুটিতে লাগিল, দ্বারে পদাঘাত করিতে লাগিল এবং শ্রাব্য অশ্রাব্য বহুবিধ ভাষা প্রয়োগ করিতে লাগিল। কিন্তু আমরা তাহাতে তিলার্ধ বিচলিত হইলাম না। স্বদেশের মঙ্গলের জন্য সমস্ত অকাতরে সহ্য করিয়া তাহাকে হিড়হিড় করিয়া টানিয়া লইয়া চলিলাম।

চলিলাম বলিতেছি, কেননা আমিও বরাবর সঙ্গে ছিলাম, কিন্তু কোথায় আমার মধ্যে একটুখানি ত্নর্বলতা ছিল, আমি তাহার গায়ে হাত দিতে পারি নাই। বরঞ্চ কেমন যেন কান্না পাইতে লাগিল।

সে যে অত্যন্ত অন্যায় করিয়াছে এবং তাহাকে গ্রামে বাহির করাই উচিত বটে, কিন্তু এটাই যে আমরা ভাল কাজ করিতেছি, সেও কিছুতে মনে করিলাম না। কিন্তু আমার কথা যাক।

আপনারা মনে করিবেন না, পল্লীগ্রামের উদারতার একান্ত অভাব। মোটেই না। বরঞ্চ বড়লোক হইলে আমরা এমন সব ঔদার্য প্রকাশ করি যে, শুনিলে আপনারা অবাক হইয়া যাইবেন।

এই মৃত্যুঞ্জয়টাই যদি তাহার হাতে ভাত খাইয়া অমার্জনীয় অপরাধ করিত, তা হইলে ত আমাদের এত রাগ হইত না। আর কায়েতের ছেলের সঙ্গ সাপুড়ের মেয়ের নিকা—এ ত একটা হাসিয়া উড়াইবার কথা! কিন্তু কাল করিল যে ঐ ভাত খাইয়া! হোক না সে আড়াই মাসের রুগী, হোক না সে শয্যাশায়ী! কিন্তু তাই বলিয়া ভাত! লুচি নয়, সন্দেশ নয়, পাঁঠার মাংস নয়! ভাত খাওয়া যে অন্ন-পাপ! সে ত আর সত্য সত্যই মাপ করা যায় না! তা নইলে পল্লীগ্রামের লোক সঙ্কীর্ণ চিত্ত নয়। চার ক্রোশ হাঁটা বিদ্যা যেসব ছেলের পেটে. তারাই ত একদিন বড় হইয়া সমাজের মাথা হয়। দেবী বীণাপাণির বরে সঙ্কীর্ণতা তাহাদের মধ্যে আসিবে কি করিয়া!

এই ত ইহারই কিছুদিন পরে, প্রাতঃস্মরণীয় স্বর্গীয় মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বিধবা পুত্রবধূ মনের বৈরাগ্যে বছর দুই কাশীবাস করিয়া যখন ফিরিয়া আসিলেন, তখন নিন্দুকেরা কানাকানি করিতে লাগিল যে অর্ধেক সম্পত্তি ঐ বিধবার এবং পাছে তাহা বেহাত হয়, এই ভয়েই ছোটবাবু অনেক চেষ্টা অনেক পরিশ্রমের পর বৌঠানকে যেখান হইতে ফিরাইয়া আনিয়াছেন, সেটা কাশীই বটে। যাই হোক, ছোটবাবু তাহার স্বাভাবিক ঔদার্যে, গ্রামের বারোয়ারী পূজা বাবদ দুইশত টাকা দান করিয়া, পাঁচখানা গ্রামের ব্রাহ্মণের সদক্ষিণা উত্তম ফলাহারের পর, প্রত্যেক সদ্‌ব্রাহ্মণের হাতে যখন একটা করিয়া

কাঁসার গেলাস দিয়া বিদায় করিলেন, তখন ধন্য ধন্য পড়িয়া গেল।

এমন কি, পথে আসিতে অনেকেই দেশের এবং দশের কল্যাণের নিমিত্ত কামনা করিতে লাগিলেন, এমন সব যারা বড়লোক, তাদের বাড়িতে বাড়িতে, মাসে মাসে এমন সব সদনুষ্ঠানের আয়োজন হয় না কেন!

কিন্তু যাক। মহত্ত্বের কাহিনী আমাদের অনেক আছে। যুগে যুগে সঞ্চিত হইয়া প্রায় প্রত্যেক পল্লীবাসীর দ্বারেই স্তূপাকার হইয়া উঠিয়াছে। এই দক্ষিণ বঙ্গের অনেক পল্লীতে অনেকদিন ঘুরিয়া গৌরব করিবার মত অনেক বড় বড় ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াছি। চরিত্রেই বল, ধর্মেই বল, সমাজেই বল, আর বিদ্যাতেই বল, শিক্ষা একেবারেই পুরা হইয়া আছে; এখন শুধু ইংরাজকে কষিয়া গালি-গালাজ করিতে পারিলেই দেশটা উদ্ধার হইয়া যায়।

বৎসর খানেক গত হইয়াছে। মশার কামড় আর সহ্য করিতে না পারিয়া সবেমাত্র সন্ন্যাসীগিরিতে ইস্তফা দিয়া ঘরে ফিরিয়াছি। একদিন দুপুরবেলা ক্রোশ-দুই দূরের মাল পাড়ার ভিতর দিয়া চলিয়াছি, হঠাৎ দেখি, একটা কুটীরের দ্বারে বসিয়া মৃত্যুঞ্জয়। তার মাথায় গেরুয়া রঙের পাগড়ি, বড় বড় দাড়ি চুল, গলায় রুদ্রাক্ষ ও পুঁতির মালা—কে বলিবে এ আমাদের সেই মৃত্যুঞ্জয়। কায়স্থের ছেলে একটা বছরের মধ্যেই জাত দিয়া একেবারে পুরাদস্তুর সাপুড়ে হইয়া গেছে। মানুষ কত শীঘ্র যে তাহার চৌদ্দ পুরুষের জাতটা বিসর্জন দিয়া আর একটা জাত হইয়া উঠিতে পারে, সে এক আশ্চর্য ব্যাপার! ব্রাহ্মণের ছেলে মেথরানী বিবাহ করিয়া মেথর হইয়া গেছে এবং তাহাদের ব্যবসা অবলম্বন করিয়াছে, এ বোধ করি আপনারা সবাই শুনিয়াছেন। আমি সদ্‌ব্রাহ্মণের ছেলেকে এণ্ট্রান্স পাস করার পরেও ডোমের মেয়ে বিবাহ করিয়া ডোম হইতে

দেখিয়াছি। এখন সে ধুচুনি কুলো বুনিয়া বিক্রয় করে, শূয়ার চরায়। ভাল কায়স্থ সন্তানকে কসাইয়ের মেয়ে বিবাহ করিয়া কসাই হইয়া যাইতেও দেখিয়াছি। আজ সে স্বহস্তে গরু কাটিয়া বিক্রয় করে—তাহাকে দেখিয়া কাহার সাধ্য বলে, কোন কালে সে কসাই ভিন্ন আর-কিছু ছিল! কিন্তু, সকলেরই ওই একই হেতু। আমার তাই ত মনে হয়, এমন করিয়া এত সহজে পুরুষকে যাহারা টানিয়া নামাইতে পারে, তাহারা কি এমনিই অবলীলাক্রমে তাহাদের ঠেলিয়া উপরে তুলিতে পারে না? যে পল্লীগ্রামে পুরুষদের সুখ্যাতিতে আজ পঞ্চমুখ হইয়া উঠিয়াছি, গৌরবটা কি একা শুধু তাহাদেরই? শুধু নিজেদের জোরেই এত দ্রুত নীচের দিকে নামিয়া চলিয়াছে! অন্দরের দিক হইতে কি এতটুকু উৎসাহ, এতটুকু সাহায্য আসে না?

কিন্তু থাক। ঝোঁকের মাথায় হয়ত বা অনাধিকার চর্চা করিয়া বসিব। কিন্তু আমার মুশকিল হইয়াছে এই যে, আমি কোনমতেই ভুলিতে পারি না, দেশের নব্বইজন নর নারীই ঐ পল্লীগ্রামেরই মানুষ এবং সেইজন্য কিছু একটা আমাদের করা চাই। যাক বলিতে ছিলাম যে, দেখিয়া কে বলিবে এ সেই মৃত্যুঞ্জয়। কিন্তু আমাকে সে খাতির করিয়া বসাইল। বিলাসী পুকুরে জল আনিতে গিয়াছিল আমাকে দেখিয়া সেও ভারি খুশি হইয়া বার বার বলিতে লাগিল, তুমি না আগলালে সে রাত্তিরে আমাকে তারা মেরেই ফেলত। আমার জন্যে কত মারই না জানি তুমি খেয়েছিলে।

কথায় কথায় শুনিলাম, পরদিনই তাহারা এখানে উঠিয়া আসিয়া ক্রমশঃ ঘর বাঁধিয়া বাস করিতেছে এবং সুখে আছে। সুখে যে আছে, এ কথা আমাকে বলার প্রয়োজন ছিল না, শুধু তাহাদের মুখের পানে চাহিয়াই আমি তাহা বুঝিয়াছিলাম।

তাই শুনিলাম, আজ কোথায় নাকি তাহাদের সাপ-ধরার বায়না

আছে এবং তাহারা প্রস্তুত হইয়াছে, আমিও অমনি সঙ্গে যাইবার জন্য লাফাইয়া উঠিলাম। ছেলেবেলা হইতেই দুটা জিনিসের উপর আমার প্রবল শখ ছিল। এক ছিল গোখরো কেউটে সাপ ধরিয়া পোষা, আর ছিল মন্ত্র-সিদ্ধ হওয়া।

সিদ্ধ হওয়ার উপায় তখনও খুঁজিয়া বাহির করিতে পারি নাই, কিন্তু মৃত্যুঞ্জয়কে ওস্তাদ লাভ করিবার আশায় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলাম। সে তাহার নামজাদা শ্বশুরের শিষ্য, সুতরাং মস্ত লোক। আমার ভাগ্য যে অকস্মাৎ এমন সুপ্রসন্ন হইয়া উঠিবে, তাহা কে ভাবিতে পারিত ?

কিন্তু শক্ত কাজ, এবং ভয়ের কারণ আছে বলিয়া প্রথমে তাহারা উভয়েই আপত্তি করিল, কিন্তু আমি এমনি নাছোড়বান্দা হইয়া উঠিলাম যে, মাস খানেকের মধ্যে আমাকে সাগরেদ করিতে মৃত্যুঞ্জয় পথ পাইল না। সাপ ধরার মন্ত্র এবং হিসাব শিখাইয়া দিল এবং কবজিতে ওষুধ-সমেত মাদুলি বাঁধিয়া দিয়া দস্তুরমত সাপুড়ে বানাইয়া তুলিল।

মন্ত্রটা কি জানেন ? তার শেষটা আমার মনে আছে—

ওরে কেউটে তুই মনসার বাহন—
মনসা দেবী আমার মা—
ওলট পালট পাতাল-ফোঁড়—
ঢোঁড়ার বিষ তুই নে, তোর বিষ ঢোঁড়ারে দে
—দুধরাজ, মণিরাজ !
কার আজ্ঞে—বিষহরির আজ্ঞে।

ইহার মানে যে কি তাহা আমি জানি না। কারণ, যিনি এই মন্ত্রের দ্রষ্টা ঋষি ছিলেন—নিশ্চয়ই—কেহ না কেহ ছিলেন—তাঁর সাক্ষাৎ কখনো পাই নাই।

অবশেষে একদিন এই মন্ত্রের সত্য-মিথ্যার চরম মীমাংসা

হইয়া গেল বটে, কিন্তু যতদিন না হইল, ততদিন সাপ ধরার জন্য চতুর্দিকে প্রসিদ্ধ হইয়া গেলাম। সবাই বলাবলি করিতে লাগিল, হ্যাঁ, ন্যাড়া একজন গুণী লোক বটে। সন্ন্যাসীর অবস্থায় কামাখ্যায় গিয়া সিদ্ধ হইয়া আসিয়াছে। এতটুকু বয়সের মধ্যে এতবড় ওস্তাদ হইয়া অহঙ্কারে আমার আর মাটিতে পা পড়ে না, এমনি জো হইল।

বিশ্বাস করিল না শুধ্ দুইজন। আমার গুরু যে, সে ত ভাল-মন্দ কোন কথাই বলিত না। কিন্তু, বিলাসী মাঝে মাঝে মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিত, ঠাকুর, এ-সব ভয়ঙ্কর জানোয়ার, একটু সাবধানে নড়াচাড়া করো। বস্তুতঃ বিষদাঁত ভাঙ্গা, সাপের মুখ হইতে বিষ বাহির করা প্রভৃতি কাজগুলা এমনি অবহেলার সহিত করিতে শুরু করিয়াছিলাম যে, সে-সব মনে পড়িলে আমার আজও গা কাঁপে।

আসল কথা হইতেছে এই যে, সাপধরাও কঠিন নয়, এবং ধরা সাপ দুই-চারি দিন হাঁড়িতে পুরিয়া রাখার পরে তাহার বিষদাঁত ভাঙ্গাই হোক, আর নাই হোক কিছুতেই কামড়াইতে চাহে না। চক্র তুলিয়া কামড়াইবার ভান করে, ভয় দেখায়, কিন্তু কামড়ায় না।

মাঝে মাঝে আমাদের গুরু-শিষ্যের সহিত বিলাসী তর্ক করিত। সাপুড়েদের সবচেয়ে লাভের ব্যবসা হইতেছে শিকড় বিক্রি করা, যা দেখাইবামাত্রই সাপ পলাইতে পথ পায় না। কিন্তু তার পূর্বে সামান্য একটু কাজ করিতে হইত, যে-সাপটা শিকড় দেখিয়া পলাইবে, তাহার মুখে একটা লোহার শিক পুড়াইয়া বারকয়েক ছ্যাঁকা দিতে হয়। তার পরে তাহাকে শিকড়ই দেখান হোক আর একটা কাঠিই দেখান হোক, সে যে কোথায় পালাইবে ভাবিয়া পায় না। এই

কাজটার বিরুদ্ধে বিলাসী ভয়ানক আপত্তি করিয়া মৃত্যুঞ্জয়কে বলিত, দেখ, এমন করিয়া মানুষ ঠকাইয়ো না।

মৃত্যুঞ্জয় কহিত, সবাই করে—এতে দোষ কি ?

বিলাসী বলিত, করুক গে সবাই। আমাদের ত খাবার ভাবনা নেই, আমরা কেন মিছিমিছি লোক ঠকাতে যাই ?

আর একটা জিনিস আমি বরাবর লক্ষ্য করিয়াছি। সাপ-ধরার বায়না আসিলেই বিলাসী নানা প্রকারে বাধা দিবার চেষ্টা করিত—আজ শনিবার, আজ মঙ্গলবার, এমনি কত কি। মৃত্যুঞ্জয় উপস্থিত না থাকিলে সে তো একেবারেই ভাগাইয়া দিত, কিন্তু উপস্থিত থাকিলে মৃত্যুঞ্জয় নগদ টাকার লোভ সামলাইতে পারিত না। আর আমার ত একরকম নেশার মত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। নানাপ্রকারে তাহাকে উত্তেজিত করিতে চেষ্টার ক্রুটি করিতাম না। বস্তুতঃ ইহার মধ্যে মজা ছাড়া ভয় যে কোথাও ছিল, এ আমাদের মনেই স্থান পাইত না। কিন্তু এই পাপের দণ্ড আমাকে একদিন ভাল করিয়াই দিতে হইল।

সেদিন ক্রোশ-দেড়েক দূরে এক গোয়ালার বাড়ি সাপ ধরিতে গিয়াছি। বিলাসী বরাবরই সঙ্গে যাইত, আজও সঙ্গে ছিল। মেটে-ঘরের মেজে খানিকটা খুঁড়িতেই একটা গর্তের চিহ্ন পাওয়া গেল। আমরা কেউই লক্ষ্য করি নাই, কিন্তু বিলাসী সাপুড়ের মেয়ে—সে হেঁট হইয়া কয়েক টুকরা কাগজ তুলিয়া লইয়া আমাকে বলিল, ঠাকুর, একটু সাবধানে খুড়ো। সাপ একটা নয়, এক জোড়া ত আছে বটেই, হয়ত বেশীও থাকতে পারে।

· মৃত্যুঞ্জয় বলিল, এরা যে সকল একটাই এসে ঢুকেছে। একটাই দেখতে পাওয়া গেছে।

বিলাসী কাগজ দেখাইয়া কহিল, দেখচ না বাসা করেছিল ?

মৃত্যুঞ্জয় কহিল, কাগজ ত ইঁদুরেও আনতে পারে!

বিলাসী কহিল, তুই-ই হতে পারে। কিন্তু দুটো আছেই আমি বলচি।

বাস্তবিক বিলাসীর কথাই ফলিল, এবং মর্মান্তিকভাবেই সেদিন ফলিল। মিনিট দশেকের মধ্যেই একটা প্রকাণ্ড খরিশ গোখরো ধরিয়া ফেলিয়া মৃত্যুঞ্জয় আমার হাতে দিল। কিন্তু সেটাকে ঝাঁপির মধ্যে পুরিয়া ফিরিতে না ফিরিতেই মৃত্যুঞ্জয় উঃ করিয়া নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার হাতের উলটা পিঠ দিয়া ঝরঝর করিয়া রক্ত পড়িতেছিল।

প্রথমটা সবাই যেন হতবুদ্ধি হইয়া গেলাম। কারণ, সাপ ধরিতে গেলে সে পলাইবার জন্য ব্যাকুল না হইয়া বরঞ্চ গর্ত হইতে একহাত মুখ বাহির করিয়া দংশন করে, এমন অভাবনীয় ব্যাপার জীবনে এই একটিবার মাত্র দেখিয়াছি। পরক্ষণেই বিলাসী চীৎকার করিয়া ছুটিয়া গিয়া আঁচল দিয়া তাহার হাতটা বাঁধিয়া ফেলিল এবং যত রকমের শিকড়-বাকড় সে সঙ্গে আনিয়াছিল, সমস্তই তাহাকে চিবাইতে দিল। মৃত্যুঞ্জয়ের নিজের মাদুলি ত ছিলই, তাহার উপরে আমার মাদুলিটাও খুলিয়া তাহার হাতে বাঁধিয়া দিলাম। আশা, বিষ ইহার ঊর্ধ্বে আর উঠিবে না। এবং আমার সেই 'বিষহরির আজ্ঞে' মন্ত্রটা সতেজে বারবার আবৃত্তি করিতে লাগিলাম। চতুর্দিকে ভিড় জমিয়া গেল এবং অঞ্চলের মধ্যে যেখানে যত গুণী ব্যক্তি আছেন, সকলকে খবর দিবার জন্য দিকে দিকে লোক ছুটিল। বিলাসীর বাপকেও সংবাদ দিবার জন্য লোক গেল।

আমার মন্ত্র পড়ার আর বিরাম নাই, কিন্তু ঠিক সুবিধা হইতেছে বলিয়া মনে হইল না। তথাপি আবৃত্তি সমভাবেই চলিতে লাগিল! কিন্তু মিনিট পনের-কুড়ি পরেই যখন মৃত্যুঞ্জয় একবার বমি করিয়া নাকে কথা কহিতে শুরু করিয়া দিল, তখন বিলাসী মাটির উপরে

একেবারে আছাড় খাইয়া পড়িল। আমিও বুঝিলাম, আমার বিষহরির দোহাই বুঝি আর খাটে না।

নিকটবর্তী আরও দুই-চারিজন ওস্তাদ আসিয়া পড়িলেন, এবং আমরা কখনো বা একসঙ্গে, কখনো বা আলাদা তেত্রিশ কোটি দেব-দেবীর দোহাই পাড়িতে লাগিলাম। কিন্তু বিষ দোহাই মানিল না, রোগীর অবস্থা ক্রমেই মন্দ হইতে লাগিল। যখন দেখা গেল ভাল কথায় হইবে না, তখন তিন-চারজন রোজা মিলিয়া বিষকে এমনি অকথ্য অশ্রাব্য গালিগালাজ করিতে লাগিল যে, বিষের কান থাকিলে সে, মৃত্যুঞ্জয়, ত মৃত্যুঞ্জয় সেদিন দেশ ছাড়িয়া পলাইত। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। আরও আধঘণ্টা ধস্তাধস্তির পরে, রোগী তাহার বাপ-মায়ের দেওয়া মৃত্যুঞ্জয় নাম, তাহার শ্বশুরের দেওয়া মন্ত্রৌষধি, সমস্ত মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়া ইহলোকের লীলা সাঙ্গ করিল। বিলাসী তাহার স্বামীর মাথাটা কোলে করিয়া বসিয়াছিল, সে যেন একেবারে পাথর হইয়া গেল।

যাক, তাহার দুঃখের কাহিনীটা আর বাড়াইব না। কেবল এইটুকু বলিয়া শেষ করিব যে, সে সাতদিনের বেশী বাঁচিয়া থাকাটা সহিতে পারিল না। আমাকে শুধু একদিন বলিয়াছিল, ঠাকুর, আমার মাথার দিব্যি রইল, এ-সব তুমি আর কখনো ক'রো না।

আমার মাদুলি-কবজ ত মৃত্যুঞ্জয়ের সঙ্গে সঙ্গে কবরে গিয়াছিল, ছিল শুধু বিষহরির আজ্ঞা। কিন্তু সে আজ্ঞা যে ম্যাজিস্ট্রেটের আজ্ঞা নয় এবং সাপের বিষ যে বাঙ্গালীর বিষ নয়, তাহা আমিও বুঝিয়াছিলাম।

একদিন গিয়া শুনিলাম, ঘরে ত বিষের অভাব ছিল না, বিলাসী আত্মহত্যা করিয়া মরিয়াছে এবং শাস্ত্রমতে সে নিশ্চয়ই নরকে গিয়াছে। কিন্তু, যেখানেই যাক, আমার নিজের যখন যাইবার সময়

আসিবে, তখন ওইরূপ কোন একটা নরকে যাওয়ার প্রস্তাবে পিছাইয়া দাঁড়াইব না একমাত্র বলিতে পারি।

খুড়ামশাই ষোল আনা বাগান দখল করিয়া অত্যন্ত বিজ্ঞের মত চারিদিকে বলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, ওর যদি না অপঘাত মৃত্যু হবে, ত হবে কার? পুরুষমানুষ এমন একটা ছেড়ে দশটা করুক না, তাতে ত তেমন আসে-যায় না—না হয় একটু নিন্দাই হ'তো। কিন্তু হাতে ভাত খেয়ে মরতে গেলি কেন? নিজে ম'লো, আমার পর্যন্ত মাথা হেঁট করে গেল। না পেলে একফোঁটা আগুন, না পেলে একটা পিণ্ডি, না হ'লো একটা ভূজ্যি উচ্ছুগ্যু।

গ্রামের লোক একবাক্যে বলিতে লাগিল, তাহাতে আর সন্দেহ কি! অন্ন-পাপ! বাপ্ রে! এর কি আর প্রায়শ্চিত্ত আছে!

বিলাসীর আত্মহত্যার ব্যাপারটাও অনেকের কাছে পরিহাসের বিষয় হইল। আমি প্রায়ই ভাবি, এ অপরাধ হয়ত ইহারা উভয়েই করিয়াছিল, কিন্তু মৃত্যুঞ্জয় ত পল্লীগ্রামেরই ছেলে, পাড়াগাঁয়ের তেলে-জলেই ত মানুষ। তবু এত বড় দুঃসাহসের কাজে প্রবৃত্ত করাইয়াছিল তাহাকে যে বস্তুটা, সেটা কেহ একবার চোখ মেলিয়া দেখিয়া পাইল না?

আমার মনে হয়, যে দেশের নর-নারীর মধ্যে পরস্পরের হৃদয় জয় করিয়া বিবাহ করিবার রীতি নাই, বরঞ্চ তাহা নিন্দার সামগ্রী, যে দেশের নর-নারী আশা করিবার সৌভাগ্য, আকাঙ্ক্ষা করিবার ভয়ঙ্কর আনন্দ হইতে চিরদিনের জন্য বঞ্চিত, যাহাদের জয়ের গর্ব, পরাজয়ের ব্যথা, কোনটাই জীবনে একটিবারও বহন করিতে হয় না, যাহাদের ভুল করিবার দুঃখ, আর ভুল না করিবার আত্মপ্রসাদ, কিছুরই বালাই নাই, যাহাদের প্রাচীন এবং বহুদর্শী বিজ্ঞ-সমাজ সর্বপ্রকারের হাঙ্গামা হইতে অত্যন্ত সাবধানে দেশের লোককে তফাত করিয়া, আজীবন কেবল ভালটি হইয়া থাকিবারই ব্যবস্থা করিয়া

দিয়াছেন, তাই বিবাহ-ব্যাপারটা যাহাদের শুধু নিছক contract তা সে যতই কেননা বৈদিক মন্ত্র দিয়া document পাকা করা হোক, সে দেশের লোকের সাধ্যই নাই মৃত্যুঞ্জয়ের অন্ন-পাপের কারণ বোঝে। বিলাসীকে যাঁহারা পরিহাস করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই সাধু গৃহস্থ এবং সাধ্বী গৃহিণী—অক্ষয় সতীলোক তাঁহারা সবাই পাইবেন, তাও আমি জানি, কিন্তু সেই সাপুড়ের মেয়েটি যখন একটি পীড়িত শয্যাগত লোককে তিল তিল করিয়া জয় করিতেছিল, তাহার তখনকার সে গৌরবের কণামাত্রও হয়ত আজিও ইহাদের কেহ চোখে দেখেন নাই। মৃত্যুঞ্জয় হয়ত নিতান্তই একটা তুচ্ছ মানুষ ছিল, কিন্তু তাহার হৃদয় জয় করিয়া দখল করার আনন্দটাও তুচ্ছ নয়, সে সম্পদও অকিঞ্চিৎকর নহে।

এই বস্তুটাই এ দেশের লোকের পক্ষে বুঝিয়া ওঠা কঠিন। আমি ভূদেববাবুর পারিবারিক প্রবন্ধেরও দোষ দিব না এবং শাস্ত্রীয় তথা সামাজিক বিধি-ব্যবস্থারও নিন্দা করিব না। করিলেও মুখের উপর কড়া জবাব দিয়া যাঁহারা বলিবেন, এই হিন্দু-সমাজ তাহার নির্ভুল বিধি-ব্যবস্থার জোরেই অত শতাব্দীর অতগুলা বিপ্লবের মধ্যে বাঁচিয়া আছে, আমি তাহাদেরও অতিশয় ভক্তি করি, প্রত্যুত্তরে আমি কখনই বলিব না, টিকিয়া থাকাই চরম সার্থকতা নয়, এবং অতিকায় হস্তী লোপ পাইয়াছে কিন্তু তেলাপোকা টিকিয়া আছে। আমি শুধু এই বলিব যে, বড়লোকের নন্দগোপালটির মত দিবারাত্রি চোখে চোখে এবং কোলে কোলে রাখিলে যে সে বেশটি থাকিবে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই, কিন্তু একেবারে তেলাপোকাটির মত বাঁচাইয়া রাখার চেয়ে এক-আধবার কোল হইতে নামাইয়া আরও পাঁচজন মানুষের মত দু-এক পা হাঁটিতে দিলেও প্রায়শ্চিত্ত করার মত পাপ হয় না।

একাদশী বৈরাগী

কালীদহ গ্রামটা ব্রাহ্মণ-প্রধান স্থান। ইহার গোপাল মুখুয্যের ছেলে অপূর্ব ছেলেবেলা হইতেই ছেলেদের মোড়ল ছিল। এবার সে যখন বছর পাঁচ-ছয় কলিকাতার মেসে থাকিয়া অনার্স-সমেত বি এ. পাশ করিয়া বাড়ি ফিরিয়া আসিল, তখন গ্রামের মধ্যে তাহার প্রসার-প্রতিপত্তির আর অবধি রইল না। গ্রামের মধ্যে জীর্ণশীর্ণ একটা হাইস্কুল ছিল—তাহার সমবয়সীরা ইতিমধ্যেই ইহাতেই পাঠ সাঙ্গ করিয়া, সন্ধ্যাহ্নিক ছাড়িয়া দিয়া দশ-আনা ছ-আনা চুল ছাঁটিয়া বসিয়াছিল; কিন্তু কলিকাতা-প্রত্যাগত এই গ্রাজুয়েট ছোকরার মাথার চুল সমান করিয়া তাহারই মাঝখানে একখণ্ড নধর টিকির সংস্থান দেখিয়া শুধু ছোকরা কেন, তাহাদের বাবাদের পর্যন্ত বিস্ময়ে তাক লাগিয়া গেল।

শহরের সভা-সমিতিতে যোগ দিয়া, জ্ঞানী লোকদিগের বক্তৃতা শুনিয়া, অপূর্ব সনাতন হিন্দুদের অনেক নিগূঢ় রহস্যের মর্মোদ্ভেদ করিয়া দেশে গিয়াছিল। এখন সঙ্গীদের মধ্যে ইহাই মুক্তকণ্ঠে প্রচার করিতে লাগিল যে, এই হিন্দুধর্মের মত এমন সনাতন ধর্ম আর নাই; কারণ ইহার প্রত্যেক ব্যবস্থাই বিজ্ঞানসম্মত। টিকির বৈদ্যুতিক উপযোগিতা, দেহরক্ষা ব্যাপারে সন্ধ্যাহ্নিকের পরম উপকারিতা, কাঁচকলা ভক্ষণের রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি বহু-বিধ অপরিজ্ঞাত তত্ত্বের ব্যাখ্যা শুনিয়া গ্রামের ছেলে-বুড়ো নির্বিশেষে অভিভূত হইয়া গেল এবং তাহার ফল হইল এই যে, অনতিকাল মধ্যেই ছেলেদের টিকি হইতে আরম্ভ করিয়া সন্ধ্যাহ্নিক.

একাদশী, পূর্ণিমা ও গঙ্গাস্নানের ঘটায় বাড়ির মেয়েরাও হার মানিল। হিন্দুধর্মের পুনরুদ্ধার, দেশোদ্ধার ইত্যাদির জল্পনা-কল্পনায় যুবক মহলে একেবারে হৈহৈ পড়িয়া গেল। বুড়ারা বলিতে লাগিল, হ্যাঁ, গোপাল মুখুয্যের বরাত বটে! মা কমলারও যেমন সুদৃষ্টি, সন্তান জন্মিয়াছেও তেমনি। না হইলে আজকালকার কালে এতগুলো ইংরাজী পাশ করিয়াও এই বয়সে এমনি ধর্মে মতিগতি কয়টা দেখা যায়! সুতরাং দেশের মধ্যে অপূর্ব একটা অপূর্ব বস্তু হইয়া উঠিল। তাহার হিন্দুধর্ম-প্রচারিণী, ধূমপান-নিবারণী ও দুর্নীতিদলনী···এই তিন-তিনটি সভার আস্ফালনে গ্রামে চাষাভুষার দল পর্যন্ত সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। পাঁচকড়ি তেওর তাড়ি খাইয়া তাহার স্ত্রীকে প্রহার করিয়াছিল শুনিতে পাইয়া অপূর্ব সদলবলে উপস্থিত হইয়া পাঁচকড়িকে এমনি শাসিত করিয়া দিল যে পরদিন পাঁচকড়ির স্ত্রী স্বামী লইয়া বাপের বাড়ি পলাইয়া গেল। ভগা কাওরা অনেক রাত্রিতে বিল হইতে মাছ ধরিয়া বাড়ি ফিরিবার পথে গাঁজার ঝোঁকে নাকি বিদ্যাসুন্দরের মালিনীর গান গাহিয়া যাইতেছিল। ব্রাহ্মণপাড়ার অবিনাশের কানে যাওয়ায়, সে তার নাক দিয়া রক্ত বাহির করিয়া তবে ছাড়িয়া দিল। দুর্গা ডোমের চৌদ্দ-পনর বছরের ছেলে বিড়ি খাইয়া মাঠে যাইতেছিল, অপূর্বর দলের ছোকরার চোখে পড়ায়, সে তাহার পিঠের উপর সেই জ্বলন্ত বিড়ি চাপিয়া ধরিয়া ফোস্কা তুলিয়া দিল। এমনি করিয়া অপূর্বর হিন্দুধর্ম-প্রচারিণী ও দুর্নীতি-দলনী সভা ভানুমতীর আমগাছের মত সদ্য সদ্যই ফুলে-ফলে কালীদহ গ্রামটাকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। এইবার গ্রামের মানসিক উন্নতির দিকে নজর দিতে গিয়া অপূর্বর চোখে পড়িল যে, স্কুলের লাইব্রেরীতে শশিভূষণের দেড়খানা মানচিত্র ও বঙ্কিমের আড়াইখানা উপন্যাস ব্যতীত আর কিছুই নাই। এই দীনতার জন্য সে হেডমাস্টারকে অশেষরূপে লাঞ্ছিত করিয়া অবশেষে নিজেই লাইব্রেরী গঠন করিতে কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া গেল।

তাহার সভাপতিত্বে চাঁদার খাতা, আইন-কানুনের তালিকা এবং পুস্তকের লিস্ট তৈরী হইতে বিলম্ব হইল না।

এতদিন ছেলেদের ধর্মপ্রচারের উৎসাহ গ্রামের লোকেরা কোনমতে সহিয়াছিল কিন্তু দুই-একদিনের মধ্যেই তাদের আদায়ের উৎসাহ গ্রামের ইতর-ভদ্র গৃহস্থের কাছে এমনি ভয়াবহ হইয়া উঠিল যে, খাতা-বগলে ছেলে দেখিলেই তাহারা বাড়ির দরজা-জানালা বন্ধ করিয়া ফেলিতে লাগিল। বেশ দেখা গেল, গ্রামে ধর্মপ্রচার ও দুর্নীতি-দলনের রাস্তা যতখানি চওড়া পাওয়া গিয়াছিল, লাইব্রেরীর জন্য অর্থসংগ্রহের পথ তাহার শতাংশের একাংশও প্রশস্ত নয়। অপূর্ব কি করিবে ভাবিতেছিল, এমন সময় হঠাৎ একটা ভারী সুরাহা চোখে পড়িল। স্কুলের অদূরে একটা পরিত্যক্ত, পোড়ো ভিটার প্রতি একদিন অপূর্বর দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। শোনা গেল, ইহা একাদশী বৈরাগীর। অনুসন্ধান করিতে জানা গেল, লোকটা কি-একটা গর্হিত সামাজিক অপরাধ করায় গ্রামের ব্রাহ্মণেরা তাহার ধোপা, নাপিত, মুদী প্রভৃতি বন্ধ করিয়া বছর-দশেক পূর্বে উদ্বাস্তু করিয়া নির্বাসিত করিয়াছেন। এখন সে ক্রোশ-দুই উত্তরে বারুইপুর গ্রামে বাস করিতেছে। লোকটা নাকি টাকার কুমির; কিন্তু তাহার সাবেক নাম যে কি, তাহা কেহই বলিতে পারে না—হাঁড়ি ফাটার ভয়ে বহু দিনের অব্যবহারে মানুষের স্মৃতি হইতে একেবারে লুপ্ত হইয়া গেছে। তদবধি এই একাদশী নামেই বৈরাগী-মহাশয় সুপ্রসিদ্ধ। অপূর্ব তাল ঠুকিয়া কহিল, টাকার কুমির! সামাজিক কদাচার! তবে ত এই ব্যাটাই লাইব্রেরীর অর্ধেক ভার বহন করিতে বাধ্য। না হইলে সেখানে ধোপা, নাপিত, মুদীও বন্ধ! বারুইপুরের, জমিদার ত দিদির মামাশ্বশুর।

ছেলেরা মাতিয়া উঠিল এবং অবিলম্বে ডোনেশনের খাতায় বৈরাগীর নামের পিছনে একটা মস্ত অঙ্কপাত হইয়া গেল। একাদশীর কাছে টাকা আদায় করা হইবে, না হইলে অপূর্ব তাহার দিদির

মামাশ্বশুরকে বলিয়া বারুইপুরেও ধোপা, নাপিত বন্ধ করিবে, সংবাদ পাইয়া রসিক স্মৃতিরত্ন লাইব্রেরীর মঙ্গলার্থ উপযাচক হইয়া পরামর্শ দিয়া গেলেন যে, বেশ একটু মোটা টাকা না দিলে মহাপাপী ব্যাটা কালীদহে বাস্তু কি করিয়া রক্ষা করে, দেখিতে হইবে। কারণ, বাস না করিলেও এই বাস্তুভিটার উপর একাদশীর যে অত্যন্ত মমতা, স্মৃতিরত্নের তাহা অগোচর ছিল না। যে-হেতু বছর-দুই পূর্বে এই জমিটুকু খরিদ করিয়া নিজের বাগানের অঙ্গীভূত করিবার অভিপ্রায়ে সবিশেষে চেষ্টা করিয়াও তিনি সফলকাম হইতে পারেন নাই। তাঁহার প্রস্তাবে তখন একাদশী অত্যন্ত সাধু ব্যক্তির ন্যায় কানে আঙ্গুল দিয়া বলিয়াছিল, এমন অনুমতি করবেন না ঠাকুরমশাই, ঐ একফোঁটা জমির বদলে ব্রাহ্মণের কাছে দাম নিতে আমি কিছুতেই পারব না। ব্রাহ্মণের সেবায় লাগবে, এ ত আমার সাতপুরুষের ভাগ্য। স্মৃতিরত্ন নিরতিশয় পুলকিত-চিত্তে তাহার দেব-দ্বিজে ভক্তি-শ্রদ্ধার লক্ষকোটি সুখ্যাতি করিয়া অসংখ্য আশীর্বাদ করার পরে, একাদশী করজোড়ে সবিনয়ে নিবেদন করিয়াছিল, কিন্তু এমনি পোড়া অদৃষ্ট ঠাকুরমশাই, যে, সাত-পুরুষের ভিটে আমার কিছুতেই হাতছাড়া করবার জো নেই। বাবা মরণকালে মাথার দিব্যি দিয়ে বলে গিয়েছিলেন, খেতেও যদি না পাস বাবা, বাস্তুভিটা কখনো ছাড়িস নে! ইত্যাদি ইত্যাদি। সে আক্রোশ স্মৃতিরত্ন বিস্মৃত হন নাই।

দিন-পাঁচেক পরে, একদিন সকালবেলা এই ছেলের দলটি দুই ক্রোশ পথ হাঁটিয়া একাদশীর সদরে আসিয়া উপস্থিত হইল। বাড়িটি মাটির কিন্তু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। দেখিলে মনে হয়, লক্ষ্মীশ্রী আছে। অপূর্ব কিংবা তাহার দলের আর কেহ একাদশীকে পূর্বে কখনো দেখে নাই, সুতরাং চণ্ডীমণ্ডপে পা দিয়াই তাদের মন বিতৃষ্ণায় ভরিয়া গেল। এ-লোক টাকার কুমিরই হোক, হাঙ্গরই হোক, লাইব্রেরীর সম্বন্ধে যে পুঁটি মাছটির উপকারে আসিবে না, তাহা নিঃসন্দেহ। একাদশীর পেশা তেজারতি। বয়স ষাটের উপর গিয়াছে। সমস্ত দেহ যেমন শীর্ণ,

তেমনি শুষ্ক। কণ্ঠভরা তুলসীর মালা। দাড়ি-গোঁফ কামান, মুখখানার প্রতি চাহিলে মনে হয় না যে কোথাও ইহার লেশমাত্র রসকস আছে। ইক্ষু যেমন নিজের রস কলের পেষণে বাহির করিয়া দিয়া, অবশেষে নিজেই ইন্ধন হইয়া তাহাকে জ্বালাইয়া শুষ্ক করে, এ ব্যক্তি যেন তেমনি মানুষকে পুড়াইয়া শুষ্ক করিবার জন্যই নিজের সমস্ত মনুষ্যত্বকে নিঙড়াইয়া বিসর্জন দিয়া মহাজন হইয়া বসিয়া আছে। তাহার শুধু চেহারা দেখিয়াই অপূর্ব মনে মনে দমিয়া গেল। চণ্ডীমণ্ডপের উপর ঢালা বিছানা। মাঝখানে একাদশী বিরাজ করিতেছে। তাহার সম্মুখে একটা কাঠের হাতবাক্স এবং একপাশে থাক-দেওয়া হিসাবের খাতাপত্র। একজন বৃদ্ধগোছের গোমস্তা খালিগায়ে পৈতার গোছা গলায় ঝুলাইয়া শ্লেটের উপর সুদের হিসাব করিতেছে এবং সম্মুখে, পার্শ্বে, বারান্দায় খুঁটির আড়ালে নানা বয়সের নানা অবস্থার স্ত্রী-পুরুষ ম্লানমুখে বসিয়া আছে। কেহ ঋণ গ্রহণ করিতে, কেহ সুদ দিতে, কেহ-বা শুধু সময় ভিক্ষা করিতেই আসিয়াছে ; কিন্তু ঋণ পরিশোধের জন্য কেহ যে বসিয়াছিল, তাহা কাহারও মুখ দেখিয়া মনে হইল না।

অকস্মাৎ কয়েকজন অপরিচিত ভদ্রসন্তান দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়া চাহিল। গোমস্তা শ্লেটখানা রাখিয়া দিয়া কহিল, কোত্থেকে আসচেন ?

অপূর্ব কহিল, কালীদহ থেকে।

মশায় আপনারা ?

আমরা সবাই ব্রাহ্মণ।

ব্রাহ্মণ শুনিয়া একাদশী সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইয়া ঘাড় ঝুঁকাইয়া প্রণাম করিল ; কহিল, বসতে আজ্ঞা হোক।

সকলে উপবেশন করিলে একাদশী নিজেও বসিল। গোমস্তা প্রশ্ন করিল, আপনাদের কি প্রয়োজন ?

অপূর্ব লাইব্রেরীর উপকারিতা-সম্বন্ধে সামান্য একটু ভূমিকা করিয়া চাঁদার কথা পাড়িতে গিয়া দেখিল, একাদশীর ঘাড় আর এক-

দিকে ফিরিয়া গিয়াছে। সে খুঁটির আড়ালের স্ত্রীলোকটিকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছে, তুমি কি ক্ষেপে গেলে হারুর মা? সুদ ত হয়েচে কুল্‌লে সাত টাকা দু'আনা; আর দু'আনাই যদি ছাড় করে নেবে, তার চেয়ে আমার গলায় পা দিয়ে জিভ বের করে মেরে ফেল না কেন?

তাহার পরে উভয়ে এমনি ধস্তাধস্তি শুরু করিয়া দিল, যেন এই দু'আনা পয়সার উপরেই তাহাদের জীবন নির্ভর করিতেছে। কিন্তু হারুর মাও যেমন স্থিরসঙ্কল্প, একাদশীও তেমনি অটল। দেরি হইতেছে দেখিয়া অপূর্ব উভয়ের বাগবিতণ্ডার মাঝখানেই বলিয়া উঠিল, আমাদের লাইব্রেরীর কথাটা—

একাদশী মুখ ফিরাইয়া বলিল, আজ্ঞে, এই যে শুনি;—হাঁ রে নফর, তুই কি আমাকে মাথায় পা দিয়ে ডুবুতে চাস রে! সে দু'টাকা এখনো শোধ দিলিনে, আবার একটাকা চাইতে এসেচিস কোন্ লজ্জায় শুনি? বলি সুদ-টুদ কিছু এনেচিস?

নফর ট্যাঁক খুলিয়া একআনা পয়সা বাহির করিতেই একাদশী চোখ রাঙ্গাইয়া কহিল, তিন মাস হয়ে গেল না রে? আর দু'টো পয়সা কই?

নফর হাতজোড় করিয়া বলিল, আর নেই কর্তা; ধাড়ার পোর কত হাতে-পায়ে পড়ে পয়সা চারটি ধার করে আনচি, বাকী দুটো পয়সা আসচে হাটবারেই দিয়ে যাব।

একাদশী গলা বাড়াইয়া দেখিয়া বলিল, দেখি তোর ওদিকের ট্যাঁকটা?

নফর বাঁ-দিকের ট্যাঁকটা দেখাইয়া অভিমানভরে কহিল, দুটো পয়সার জন্য মিছে কথা কইচি কর্তা? যে শালা পয়সা এনেও তোমাদের ঠকায়, তার মুখে পোকা পড়ুক, এই বলে দিলুম।

একাদশী তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল, খুট চারটে পয়সা ধার করে আনতে পারলি, আর দুটো এমনি ধার করতে পারলি নে? নফর রাগিয়া কহিল, মাইরি দিলাসা করলুম না কর্তা! মুখে পোকা পড়ুক।

অপূর্বর গা জ্বলিয়া যাইতেছিল, সে আর সহ্য করিতে না পারিয়া বলিয়া উঠিল, আচ্ছা লোক তুমি মশায় !

একাদশী একবার চাহিয়া দেখিল মাত্র, কোন কথা কহিল না। পরাণ বাগদী সম্মুখের উঠান দিয়া যাইতেছিল। একাদশী হাত নাড়িয়া ডাকিয়া কহিল, পরাণ, নফ্‌রার কাছাটা একবার খুলে দেখ ত রে, পয়সা দুটো বাঁধা আছে নাকি ?

পরাণ উঠিয়া আসিতেই নফর রাগ করিয়া তাহার কাছার খুঁটে বাঁধা পয়সা দুটো খুলিয়া একাদশীর সম্মুখে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল, একাদশী এই বেয়াদপিতে কিছুমাত্র রাগ করিল না। গম্ভীর মুখে পয়সা দুটা বাক্সে তুলিয়া রাখিয়া গোমস্তাকে কহিল, ঘোষালমশাই, নফ্‌রার নামে সুদ আদার জমা করে নেন। হাঁ রে, একটা টাকা কি আবার করবি রে ?

নফর কহিল, আবশ্যক না হলেই কি এয়েচি মশাই ?

একাদশী কহিল, আট আনা নিয়ে যা না ! গোটা টাকা নিয়ে গেলেই ত নয়-ছয় করে ফেলবি রে !

তার পরে অনেক ঘষা-মাজা করিয়া নফর মোড়ল বারো আনা পয়সা কর্জ লইয়া প্রস্থান করিল।

বেলা বাড়িয়া উঠিতেছিল। অপূর্বর সঙ্গী অনাথ চাঁদার খাতাটা একাদশীর সম্মুখে নিক্ষেপ করিয়া কহিল, যা দেবেন দিয়ে দিন মশাই, আমরা আর দেরী করতে পারিনে।

একাদশী খাতাটা তুলিয়া লইয়া প্রায় পনের মিনিট ধরিয়া আগাগোড়া তন্ন তন্ন করিয়া নিরীক্ষণ করিয়া শেষে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া খাতাটা ফিরাইয়া দিয়া বলিল, আমি বুড়োমানুষ, আমার কাছে চাঁদা কেন ?

অপূর্ব কোনমতে রাগ সামলাইয়া কহিল, বুড়োমানুষ টাকা দেবে না ত কি ছোট ছেলেতে টাকা দেবে ? তারা পাবে কোথায় শুনি ?

বুড়ো সে কথার উত্তর না দিয়া কহিল, ইস্কুল ত হয়েচে কুড়ি-পঁচিশ

বছর ; কৈ, এতদিন ত কেউ লাইব্রেরীর কথা তোলেনি বাপু ? ত যাক, এত ত আর মন্দ কাজ নয়, আমাদের ছেলেপুলে বই পড়ুক, আর না পড়ুক, আমার গাঁয়ের ছেলেরাই পড়বে ত ! কি বল ঘোষালমশাই ? ঘোড়াল ঘাড় নাড়িয়া কি যে বলিল, বোঝা গেল না ! একাদশী কহিল, তা বেশ, চাঁদা দেব আমি, একদিন এসে নিয়ে যাবেন চার আনা পয়সা। কি বল ঘোষাল, এর কমে আর ভাল দেখায় না। অতদূর থেকে ছেলেরা এসে ধরেচে, যা হোক একটু নাম-ডাক আছে বলেই ত ! আরও ত লোক আছে, তাদের কাছে ত চাইতে যায় না, কি বল হে !

ক্রোধে অপূর্বর মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। অনাথ কহিল, এই চার আনার জন্যে আমরা এতদূরে এসেচি ? তাও আবার আর একদিন এসে নিয়ে যেতে হবে ?

একাদশী মুখে একটা শব্দ করিয়া মাথা নাড়িয়া নাড়িয়া বলিতে লাগিল, দেখলেন ত অবস্থা, ছটা পয়সা হক্কের সুদ আদায় করতে ব্যাটাদের কাছে কি ছ্যাঁচড়াপনাই না করতে হয় ? তা এ পাট-টা বিক্রি হয়ে না গেলে আর চাঁদা দেবার সুবিধে—

অপূর্বর রাগে ঠোঁট কাঁপিতে লাগিল ; বলিল, সুবিধে হবে এখানেও ধোপা নাপিত বন্ধ হলে। ব্যাটা পিশাচ সর্বাঙ্গে ছিটেফোঁটা কেটে জাত হারিয়ে বোষ্টম হয়েছেন, আচ্ছা !

বিপিন উঠিয়া দাঁড়াইয়া একটি আঙুল তুলিয়া শাসাইয়া কহিল, বারুইপুরের রাখালদাসবাবু আমাদের কুটুম্ব, মনে থাকে যেন বৈরাগী !

বুড়া বৈরাগী এই অভাবনীয় কাণ্ডে হতবুদ্ধি হইয়া চাহিয়া রহিল। বিদেশী ছেলেদের অকস্মাৎ এত ক্রোধের হেতু সে কিছুতেই বুঝিতে পারিল না। অপূর্ব বলিল, গরীবের রক্ত শুষে সুদ খাওয়া তোমার বার করব তবে ছাড়ব।

নফর তখনও বসিয়া ছিল ; তাহার কাছায় বাঁধা পয়সা দুটো আদায় করার রাগে মনে মনে ফুলিতেছিল : সে কহিল যা কইলেন

কর্তা, তা ঠিক। বৈরাগী ত নয়, পিচেশ! চোখে দেখলেন ত কি করে মোর পয়সা দুটো আদায় নিলে!

বুড়োর লাঞ্ছনায় উপস্থিত সকলেই মনে মনে নির্মল আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিল। তাহাদের মুখের ভাব লক্ষ্য করিয়া বিপিন উৎসাহিত হইয়া চোখ টিপিয়া বলিয়া উঠিল, তোমরা ত ভেতরের কথা জানো না, কিন্তু আমাদের গাঁয়ের লোক. আমরা সব জানি। কে গো বুড়ো, আমাদের গাঁয়ে কেন তোমার ধোপা-নাপতে বন্ধ হয়েছিল বলব?

খবরটা পুরাতন। সবাই জানিত। একাদশী সদ্গোপের ছেলে. জাত-বৈষ্ণব নহে। তাহার একমাত্র বৈমাত্রেয় ভগিনী প্রলোভনে পড়িয়া কুলের বাহির হইয়া গেলে. একাদশী অনেক দুঃখে অনেক অনুসন্ধানে তাহাকে ঘরে ফিরাইয়া আনে। কিন্তু এই কদাচারে গ্রামের লোক বিস্মিত ও অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে। তথাপি একাদশী মা-বাপ মরা এই বৈমাত্র ছোটবোনটিকে কিছুতেই পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। সংসারে তাহার আর কেহ ছিল না; ইহাকেই সে শিশুকাল হইতে কোলে-পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছিল, তাহার ঘটা করিয়া বিবাহ দিয়াছিল। আবার অল্প বয়সে বিধবা হইয়া গেলে. দাদার ঘরেই সে আদর-যত্নে ফিরিয়া আসিয়াছিল। বয়স এবং বুদ্ধির দোষে এই ভগিনীর এতবড় পদস্খলনে বৃদ্ধ কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিল; আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া গ্রামে গ্রামে শহরে শহরে ঘুরিয়া অবশেষে যখন তাহার সন্ধান পাইয়া তাহাকে ঘরে ফিরাইয়া আনিল, তখন গ্রামের লোকের নিষ্ঠুর অনুশাসন মাথায় তুলিয়া লইয়া, তাহার এই লজ্জিতা, একান্ত অনুতপ্তা, দুর্ভাগিনী ভগিনীটিকে আবার গৃহের বাহির করিয়া দিয়া নিজে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া জাতে উঠিতে একাদশী কোনমতেই রাজী হইতে পারিল না। অতঃপর গ্রামে তাহার ধোপা-নাপিত-মুদী প্রভৃতি বন্ধ হইয়া গেল। একাদশী নিরুপায় হইয়া ভেক লইয়া বৈষ্ণব হইয়া এই বারুইপুরে পলাইয়া আসিল; কথাটা সবাই জানিত;

তথাপি আর একজনের মুখ হইতে আর একজনের কলঙ্ক-কাহিনীর মাধুর্যটা উপভোগ করিবার জন্য সবাই উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিল। কিন্তু একাদশী লজ্জায় ভয়ে একেবারে জড়সড় হইয়া গেল। তাহার নিজের জন্য নয়, ছোট বোনটির জন্য। প্রথম যৌবনের অপরাধ গৌরীর বুকের মধ্যে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করিয়াছিল, আজিও যে তাহা তেমনি আছে, তিলার্ধও শুষ্ক হয় নাই, বৃদ্ধ তাহা ভালরূপেই জানিত। পাছে বিন্দুমাত্র ইঙ্গিতও তাহার কানে গিয়া সেই ব্যথা আলোড়িত হইয়া উঠে, এই আশঙ্কায় একাদশী বিবর্ণমুখে নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল। তাহার এই সকরুণ দৃষ্টির নীরব মিনতি আর কাহারও চক্ষে পড়িল না, কিন্তু অপূর্ব হঠাৎ অনুভব করিয়া বিস্ময়ে অবাক হইয়া গেল।

বিপিন বলিতে লাগিল, আমরা কি ভিখিরী যে দু'কোশ পথ হেঁটে এই রৌদ্রে চারগণ্ডা পয়সা ভিক্ষা চাইতে এসেচি? তাও আবার আজ নয়, কবে ওঁর কোন্‌ খাতকের পাট বিক্রি হবে, সেই খবর নিয়ে আমাদের আর একদিন হাঁটতে হবে—তবে যদি বাবুর দয়া হয়! কিন্তু লোকের রক্ত শুষে সুদ খাও বুড়ো, মনে করচে জোঁকের গায়ে জোঁক বসে না? আমি এখানেও না তোমার হাড়ির হাল করি ত আমার নাম বিপিন ভট্‌চায্যিই নয়। ছোটজাতের পয়সা হয়েছে বলে চোখে কানে আর দেখতে পাও না! চল হে অপূর্ব আমরা যাই, তার পরে যা জানি করা যাবে। বলিয়া সে অপূর্বর হাত ধরিয়া টান দিল।

বেলা এগারটা বাজিয়া গিয়াছিল। বিশেষতঃ এতটা পথ হাঁটিয়া আসিয়া অপূর্বর অত্যন্ত পিপাসা বোধ হওয়ায় কিছুক্ষণ পূর্বে চাকরটাকে সে জল আনিতে বলিয়া দিয়াছিল। তাহার পর কলহ-বিবাদে সে কথা মনে ছিল না। কিন্তু তাহার তৃষ্ণার জল এক হাতে এবং অন্য হাতে রেকাবিতে গুটি-কয়েক বাতাসা লইয়া একটি সাতাশ-আটাশ বছরের বিধবা মেয়ে পাশের দরজা ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে তাহার জল চাওয়ার কথা স্মরণ হইল। গৌরীকে ছোট

জাতের মেয়ে বলিয়া কিছুতেই মনে হয় না। পরনে গরদের কাপড় স্নানের পর বোধ করি, এইমাত্র আহ্নিক করিতে বসিয়াছিল, ব্রাহ্মণ জল চাহিয়াছে, চাকরের কাছে শুনিয়া সে আহ্নিক ফেলিয়া ছুটিয়া আসিয়াছে। কহিল, আপনাদের কে জল চেয়েছিলেন যে?

বিপিন কহিল, পাটের শাড়ি পরে এলেই বুঝি তোমার হাতে জল খাব আমরা? অপূর্ব, ইনিই সে বিদ্যেধরী হে!

চক্ষের নিমিষে মেয়েটির হাত হইতে বাতাসার রেকাবটা ঝনাৎ করিয়া নীচে পড়িয়া গেল এবং সেই অসীম লজ্জা চোখে দেখিয়া অপূর্ব নিজেই লজ্জায় মরিয়া গেল। সক্রোধে বিপিনকে একটা কনুইয়ের গুঁতো মারিয়া কহিল, এ-সব কি বাঁদরামি হচ্ছে? কাণ্ডজ্ঞান নেই?

বিপিন পাড়াগাঁয়ের মানুষ, কলহের মুখে অপমান করিতে নর-নারী-ভেদাভেদজ্ঞান-বিবর্জিত নিরপেক্ষ বীরপুরুষ। সে অপূর্বর খোঁচা খাইয়া আরও নিষ্ঠুর হইয়া উঠিল। চোখ রাঙ্গাইয়া হাঁকিয়া কহিল, কেন, মিছে কথা বলচি নাকি? ওর এতবড় সাহস যে, বামুনের ছেলের জন্য জল আনে? আমি হাটে হাঁড়ি ভেঙ্গে দিতে পারি জান?

অপূর্ব বুঝিল আর তর্ক নয়। অপমানের মাত্রা তাহাতে বাড়িবে বৈ কমিবে না। কহিল, আমি আনতে বলেছিলুম বিপিন, তুমি না জেনে অনর্থক ঝগড়া ক'রো না। চল, আমরা এখন যাই।

গৌরী রেকাবিটা কুড়াইয়া লইয়া, কাহারও প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া নিঃশব্দে দরজার আড়ালে গিয়া দাঁড়াইল। তথা হইতে কহিল, দাদা, এঁরা যে কিসের চাঁদা নিতে এসেছিলেন, তুমি দিয়েচ?

একাদশী এতক্ষণ পর্যন্ত বিহ্বলের ন্যায় বসিয়া ছিল, ভগিনীর আহ্বানে চকিত হইয়া বলিল, না, এই যে দিই দিদি!

অপূর্বর প্রতি চাহিয়া হাতজোড় করিয়া কহিল, বাবুমশাই, আমি গরীব মানুষ। চার আনাই আমার পক্ষে ঢের, দয়া করে নিন।

বিপিন পুনরায় কি একটা কড়া জবাব দিতে উদ্যত হইয়াছিল,

অপূর্ব ইঙ্গিতে তাহাকে নিষেধ করিল ; কিন্তু এত কাণ্ডের পর সেই চার আনার প্রস্তাবে কাহার নিজেরও অত্যন্ত ঘৃণাবোধ হইল। আত্মসংবরণ করিয়া কহিল, থাক বৈরাগী, তোমায় কিছু দিতে হবে না।

একাদশী বুঝিল, ইহা রাগের কথা ; একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, কলিকাল! বাগে পেলে কেউ কারও ঘাড় ভাঙতে ছাড়ে! দাও ঘোষালমশাই, পাঁচ গণ্ডা পয়সাই খাতায় খরচ লেখ। কি আর করব বল। বলিয়া বৈরাগী পুনরায় একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করিল। তাহার মুখ দেখিয়া অপূর্বর একবার হাসি পাইল। এই কুসীদজীবী বৃদ্ধের পক্ষে চার আনার এবং পাঁচ আনার মধ্যে কতবড় যে প্রকাণ্ড প্রভেদ, তাহা সে মনে মনে বুঝিল ; মৃদু হাসিয়া কহিল. থাক বৈরাগী, তোমায় দিতে হবে না। আমরা চার-পাঁচ আনা পয়সা নিইনে। আমরা চললুম।

কি জানি কেন. অপূর্ব একান্ত আশা করিয়াছিল, এই পাঁচ আনার বিরুদ্ধে দ্বারের অন্তরাল হইতে অন্ততঃ একটা প্রতিবাদ আসিবে। তাহার অঞ্চলের প্রান্তটুকু তখনও দেখা যাইতেছিল. কিন্তু সে কোন কথা কহিল না। যাইবার পূর্বে অপূর্ব যথার্থই ক্ষোভের সহিত মনে মনে কহিল, ইহারা বাস্তবিকই অত্যন্ত ক্ষুদ্র। দান করা সম্বন্ধে পাঁচ আনা পয়সার অধিক ইহাদের ধারণা নাই। পয়সাই ইহাদের প্রাণ. পয়সাই ইহাদের অস্থি-মাংস. পয়সার জন্য ইহারা করিতে পারে না এমন কাজ সংসারে নাই।

অপূর্ব সদলবলে উঠিয়া দাঁড়াইতেই একটি বছর-দশেকের ছেলের প্রতি অনাথের দৃষ্টি পড়িল। ছেলেটির গলায় উত্তরীয়, বোধ করি পিতৃবিয়োগ কিংবা এমন কিছু একটা ঘটিয়া থাকিবে। তাহার বিধবা জননী বারান্দায় খুঁটির আড়ালে বসিয়া ছিল। অনাথ আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, পুঁটে, তুই যে এখানে?

পুঁটে আঙুল দেখাইয়া কহিল, আমার মা বসে আছেন। মা

বললেন, আমাদের অনেক টাকা ওঁর কাছে জমা আছে। বলিয়া সে একাদশীকে দেখাইয়া দিল।

কথাটা শুনিয়া সকলেই বিস্মিত ও কৌতূহলী হইয়া উঠিল। ইহার শেষ পর্যন্ত কি দাঁড়ায় দেখিবার জন্য অপূর্ব নিজের আকণ্ঠ পিপাসা সত্ত্বেও বিপিনের হাত ধরিয়া বসিয়া পড়িল।

একাদশী প্রশ্ন করিল, তোমার নামটি কি বাবা? বাড়ি কোথায়?

ছেলেটি কহিল, আমার নাম শশধর; বাড়ি ওঁদের গাঁয়ে—কালীদহে।

তোমার বাবার নামটি কি?

ছেলেটির হইয়া অনাথ জবাব দিল, কহিল, এর বাপ অনেকদিন মারা গেছে। পিতামহ রামলোচন চাটুয্যে ছেলের মৃত্যুর পর সংসার ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছিলেন; সাত বৎসর পরে মাস-খানেক হ'ল ফিরে এসেছিলেন। পরশু এদের ঘরে আগুন লাগে, আগুন নিবোতে গিয়ে বৃদ্ধ মারা পড়েচেন। আর কেউ নেই, এর নাতিটিই শ্রাদ্ধাধিকারী।

কাহিনী শুনিয়া সকলে দুঃখ প্রকাশ করিল, শুধু একাদশী চুপ করিয়া রহিল। একটু পরেই প্রশ্ন করিল, টাকার হাতচিটা আছে? যাও, তোমার মাকে জিজ্ঞাসা করে এস।

ছেলেটি জিজ্ঞাসা করিয়া আসিয়া কহিল, কাগজ-পত্র কিচ্ছু নেই, সব পুড়ে গেছে।

একাদশী প্রশ্ন করিল, কত টাকা?

এবার বিধবা অগ্রসর হইয়া আসিয়া মাথার কাপড়টা সরাইয়া জবাব দিল, ঠাকুর মরবার আগে বলে গেছেন, পাঁচশ টাকা তিনি জমা রেখে তীর্থযাত্রা করেন। বাবা আমরা বড় গরীব; সব টাকা না দাও, কিছু আমাদের ভিক্ষা দাও, বলিয়া বিধবা টিপিয়া টিপিয়া কাঁদিতে লাগিল। ঘোষালমশাই এতক্ষণ খাতা লেখা ছাড়িয়া একাগ্রচিত্তে শুনিতেছিলেন, তিনিই অগ্রসর হইয়া প্রশ্ন করিলেন,

বলি কেউ সাক্ষী-টাক্ষী আছে ?

বিধবা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না। আমরাও জানতুম না। ঠাকুর গোপনে টাকা জমা রেখে বেরিয়ে গিয়েছিলেন।

ঘোষাল মৃদু হাস্য করিয়া বলিলেন, শুধ্ কাঁদলেই ত হয় না বাপু! এ-সব মবলগ টাকাকড়ির কাণ্ড যে! সাক্ষী নেই, হাতচিটা নেই, তা হলে কি রকম হবে বল দেখি ?

বিধবা ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল, কিন্তু কান্নার ফল যে কি হইবে তাহা কাহারও বুঝিতে বাকী রহিল না। একাদশী এবার কথা কহিল; ঘোষালের প্রতি চাহিয়া কহিল, আমার মনে হচ্চে, যেন পাঁচশ টাকা কে জমা রেখে আর নেয়নি। তুমি একবার পুরানো খাতাগুলো খুঁজে দেখ দিকি, কিছু লেখা-টেখা আছে নাকি ?

ঘোষাল ঝঙ্কার দিয়া কহিল, কে এতবেলায় ভূতের ব্যাগার খাটতে যাবে বাপু ? সাক্ষী নেই, রসিদ-পত্তর নেই—

কথাটা শেষ হইবার পূর্বেই দ্বারের অন্তরাল হইতে জবাব আসিল, রসিদ-পত্তর নেই বলে কি ব্রাহ্মণের টাকাটা ডুবে যাবে নাকি ? পুরনো খাতা দেখুন, আপনি না পারেন আমাকে দিন, দেখে দিচ্চি।

সকলেই বিস্মিত হইয়া দ্বারের প্রতি চোখ তুলিল; কিন্তু যে হুকুম দিল তাহাকে দেখা গেল না।

ঘোষাল নরম হইয়া কহিল, কত বছর হয়ে গেল মা ? এতদিনের খাতা খুঁজে বার করা ত সোজা নয়। খাতা-পত্তরের আণ্ডিল! তা জমা থাকে, পাওয়া যাবে বৈ কি! বিধবাকে উদ্দেশ্য করিয়া কহিল, তুমি বাছা কেঁদো না, হকের টাকা হয় ত পাবে বৈ কি। আচ্ছা, কাল একবার আমার বাড়ি যেয়ো; সব কথা জিজ্ঞাসা করে খাতা দেখে বার করে দেব। আজ এতবেলায় ত আর হবে না।

বিধবা তৎক্ষণাৎ সম্মত হইয়া কহিল, আচ্ছা বাবা, কাল সকালেই আপনার ওখানে যাব।

যেয়ো, বলিয়া ঘোষাল ঘাড় নাড়িয়া সম্মুখে খোলা খাতা সেদিনের মত বন্ধ করিয়া ফেলিল।

কিন্তু জিজ্ঞাসাবাদের ছলে বিধবাকে বাড়িতে আহ্বান করার অর্থ অত্যন্ত সুস্পষ্ট। অন্তরাল হইতে গৌরী কহিল, আট বছর আগের—তাহলে ১৩০১ সালের খাতাটা একবার খুলে দেখুন ত, টাকা জমা আছে কি না?

ঘোষাল কহিলেন, এত তাড়াতাড়ি কিসের মা!

গৌরী কহিল, আমাকে দিন, আমি দেখে দিচ্চি। ব্রাহ্মণের মেয়ে দু'কোশ হেঁটে এসেচেন—দু'কোশ এই রৌদ্রে হেঁটে যাবেন, আবার কাল আপনার কাছে আসবেন; এত হাঙ্গামায় কাজ কি ঘোষালকাকা।

একাদশী কহিল, সত্যিই ত ঘোষালমশাই; ব্রাহ্মণের মেয়েকে মিছামিছি হাঁটান কি ভাল? বাপ রে! দাও, দাও, চটপট দেখে দাও।

ক্রুদ্ধ ঘোষাল তখন রুদ্ধকণ্ঠে উঠিয়া গিয়া পাশের ঘর হইতে ১৩০১ সালের খাতা বাহির করিয়া আনিলেন।

মিনিট-দশেক পাতা উলটাইয়া হঠাৎ ভয়ানক খুশী হইয়া বলিয়া উঠিলেন, বাঃ! আমার গৌরীমায়ের কি সূক্ষ্ম বুদ্ধি! ঠিক এক সালের খাতাতেই জমা পাওয়া গেল! এই যে রামলোচন চাটুয্যের জমা পাঁচশ—

একাদশী কহিল, দাও, চটপট সুদটা কষে দাও ঘোষালমশাই।

ঘোষাল বিস্মিত হইয়া কহিল, আবার সুদ?

একাদশী কহিল, বেশ, দিতে হবে না! টাকাটা এতদিন খেটেচে ত. বসে ত থাকেনি। আট বছরের সুদ, এই ক'মাস সুদ বাদ পড়বে।

তখন সুদে-আসলে প্রায় সাড়ে-সাতশ টাকা হইল। একাদশী ভগিনীকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, দিদি, টাকাটা তবে সিন্দুক থেকে বার করে আন। হাঁ বাছা, সব টাকাটাই একসঙ্গে নিয়ে যাবে ত?

বিধবার অন্তরের কথা অন্তর্যামী শুনিলেন; চোখ মুছিয়া প্রকাশ্যে কহিল, না বাবা. এত টাকায় আমার কাজ নেই; আমাকে পঞ্চাশটি

টাকা এখন শুধু দাও।

তাই নিয়ে যাও মা। ঘোষালমশাই, খাতাটা একবার দাও, সই করে নেই ; আর বাকী টাকার তুমি একটা চিঠি করে দাও।

ঘোষাল কহিল, আমি সই করে এনে নিচ্চি। তুমি আবার—

একাদশী কহিল, না না, আমাকেই দাও না ঠাকুর, নিজের চোখে দেখে দিই। বলিয়া খাতা লইয়া অর্ধমিনিট চোখ বুলাইয়া হাসিয়া কহিল, ঘোষালমশাই, এই যে একজোড়া আসল মুক্তা ব্রাহ্মণের নামে জমা রয়েছে। আমি জানি কিনা, ঠাকুরমশাই আমাদের সব সময় চোখে দেখতে পায় না, বলিয়া একাদশী দরজার দিকে চাহিয়া একটু হাসিল। এতগুলি লোকের সুমুখে মনিবের সেই ব্যঙ্গোক্তিতে ঘোষালের মুখ কালো হয়ে গেল।

সেদিনের সমস্ত কর্ম নির্বাহ হইলে অপূর্ব সঙ্গীদের লইয়া যখন উত্তপ্ত পথের মধ্যে বাহির হইয়া পড়িল, তখন তাহার মনের মধ্যে একটা বিপ্লব চলিতেছিল। ঘোষাল সঙ্গে ছিল, সে সবিনয়ে আহ্বান করিয়া কহিল, আসুন, গরীবের ঘরে অন্ততঃ একটু গুড় দিয়েও জল খেয়ে যেতে হবে।

অপূর্ব কোন কথা না কহিয়া নীরবে অনুসরণ করিল। ঘোষালের গা জ্বলিয়া যাইতেছিল। সে একাদশীকে উদ্দেশ্য করিয়া কহিল, দেখলেন, ছোটলোক ব্যাটার আস্পর্ধা? আপনাদের মত ব্রাহ্মণ-সন্তানের পায়ের ধূলো পড়েছে, হারামজাদার যোল পুরুষের ভাগ্যি! ব্যাটা পিচেশ কিনা পাঁচ গণ্ডা পয়সা দিয়ে ভিখারী বিদেয় করতে চায়।

বিপিন কহিল, দু'দিন সবুর করুন না ; হারামজাদা মহাপাপীর ধোপা-নাপতে বন্ধ করে পাঁচ গণ্ডা পয়সা দেওয়া বার করে দিচ্চি। রাখালবাবু আমাদের কুটুম, সে মনে রাখবেন ঘোষালমশাই।

ঘোষাল কহিল, আমি ব্রাহ্মণ! দু'বেলা সন্ধ্যে-আহ্নিক না করে জলগ্রহণ করিনে, দুটো মুক্তোর জন্যে কি-রকম অপমানটা দুপুর-বেলায় আমাকে করলে চোখে দেখলেন ত। ব্যাটার ভাল হবে?

মনেও করবেন না। সে-বেটী—যারে ছুঁলে নাইতে হয়, কিনা বামুনের ছেলের তেষ্টার জল নিয়ে আসে, টাকার গুমরটা কি রকম হয়েচে, একবার ভেবে দেখুন দেখি!

অপূর্ব এতক্ষণ একটা কথাতেও কথা যোগ করে নাই; সে হঠাৎ পথের মাঝখানে দাঁড়াইয়া পড়িয়া কহিল, অনাথ আমি ফিরে চললুম ভাই, আমার ভারী তেষ্ঠা পেয়েচে।

ঘোষাল আশ্চর্য হইয়া কহিল, ফিরে কোথায় যাবেন? ঐ ত আমার বাড়ি দেখা যাচ্ছে।

অপূর্ব মাথা নাড়িয়া বলিল, আপনি এদের নিয়ে যান, আমি যাচ্ছি ঐ একাদশীর বাড়িতেই জল খেতে।

একাদশীর বাড়িতে জল খেতে! সকলেই চোখ কপালে তুলিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। বিপিন তাহার হাত ধরিয়া একটা টান দিয়া বলিল, চল, চল—দুপুর রোদ্দুরে রাস্তার মাঝখানে আর ঢঙ্ করতে হবে না। তুমি সেই পাত্রই বটে! তুমি খাবে একাদশীর বোনের ছোঁয়া জল!

অপূর্ব হাত টানিয়া লইয়া দৃঢ়স্বরে কহিল, সত্যিই আমি তার দেওয়া সেই জলটুকু খাবার জন্য ফিরে যাচ্ছি। তোমরা ঘোষালমশায়ের ওখান থেকে খেয়ে এস, ঐ গাছতলায় আমি অপেক্ষা করে থাকব।

তাহার শান্ত স্থির কণ্ঠস্বরে হতবুদ্ধি হইয়া ঘোষাল কহিল, এর প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় তা জানেন?

অনাথ কহিল, ক্ষেপে গেলে নাকি?

অপূর্ব কহিল, তা জানিনে? কিন্তু প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় সে তখন ধীরে-সুস্থে করা যাবে। কিন্তু এখন ত পারলাম না, বলিয়া সে এই খর-রৌদ্রের মধ্যে দ্রুতপদে একাদশীর বাড়ীর উদ্দেশে প্রস্থান করিল।

ছবি

॥ এক ॥

এই কাহিনী যে সময়ের, তখনও ব্রহ্মদেশ ইংরাজের অধীনে আসে নাই। তখনও তাহার নিজের রাজারানী ছিল, পাত্রমিত্র ছিল, সৈন্য-সামন্ত ছিল; তখন পর্যন্ত তাহারা নিজেদের দেশ নিজেরাই শাসন করিত।

মান্দালে রাজধানী, কিন্তু রাজবংশের অনেকেই দেশের বিভিন্ন শহরে গিয়া বসবাস করিতেন।

এমনি বোধ হয় একজন কেহ বহুকাল পূর্বে পেগুর ক্রোশ-পাঁচেক দক্ষিণে ইমেদিন গ্রামে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন।

তাঁদের প্রকাণ্ড অট্টালিকা, প্রকাণ্ড বাগান, বিস্তর টাকাকড়ি, মস্ত জমিদারি। এই সকলের মালিক যিনি, তাঁর একদিন যখন পরকালের ডাক পড়িল, তখন বন্ধুকে ডাকিয়া কহিলেন, বা-কো, ইচ্ছে ছিল তোমার ছেলের সঙ্গে আমার মেয়ের বিবাহ দিয়া যাইব। কিন্তু সে-সময় হইল না। মা-শোয়ে রহিল, তাহাকে দেখিও।

ইহার বেশি বলার তিনি প্রয়োজন দেখিলেন না। বা-কো তাঁর ছেলেবেলার বন্ধু। একদিন তাহারও অনেক টাকার সম্পত্তি ছিল, শুধু ফয়ার মন্দির গড়াইয়া আর ভিক্ষু খাওয়াইয়া আজ কেবল সে সর্বস্বান্ত নয়, ঋণগ্রস্ত। তথাপি এই লোকটিকেই তাঁহার যথাসর্বস্বের সঙ্গে একমাত্র কন্যাকে নির্ভয়ে সঁপিয়া দিতে এই মুমূর্ষুর লেশমাত্র বাধিল না। বন্ধুকে চিনিয়া লইবার এতবড় সুযোগই তিনি এ

জীবনে পাইয়াছিলেন। কিন্তু এ দায়িত্ব বা-কোকে অধিক দিন বহন করিতে হইল না। তাঁহারও ও-পারের শমন আসিয়া পৌঁছিল এবং সেই মহামান্য পরওয়ানা মাথায় করিয়া বৃদ্ধ. বৎসর না ঘুরিতেই যেখানের ভার সেখানেই ফেলিয়া রাখিয়া অজানার দিকে পাড়ি দিলেন।

এই ধর্মপ্রাণ দরিদ্র লোকটিকে গ্রামের লোক যত ভালবাসিত. শ্রদ্ধা-ভক্তি করিত. তেমনি প্রচণ্ড আগ্রহে তাহারা ইঁহার মৃত্যু-উৎসব শুরু করিয়া দিল।

বা-কোর মৃতদেহ মাল্য-চন্দনে সজ্জিত হইয়া পালঙ্কে শয়ান রহিল এবং নীচে খেলাধূলা, নৃত্যগীত ও আহার-বিহারের স্রোত রাত্রি-দিন অবিরাম বহিতে লাগিল। মনে হইল ইহার বুঝি আর শেষ হইবে না।

পিতৃ-শোকের এই উৎকট আনন্দ হইতে ক্ষণকালের জন্য কোনমতে পলাইয়া বা-থিন একটা নির্জন গাছের তলায় বসিয়া কাঁদিতেছিল, হঠাৎ চমকিয়া ফিরিয়া দেখিল. মা-শোয়ে তাহার পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সে ওড়নার প্রান্ত দিয়া নিঃশব্দে তাহার চোখ মুছিয়া দিল এবং পাশে বসিয়া তাহার ডান হাতটা নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া চুপি চুপি বলিল. বাবা মরিয়াছেন, কিন্তু তোমার মা-শোয়ে এখনও বাঁচিয়া আছে।

॥ দুই ॥

বা-থিন ছবি আঁকিত। তাহার শেষ ছবিখানি সে একজন সওদাগরকে দিয়া রাজার দরবারে পাঠাইয়া দিয়াছিল। রাজা ছবিখানি গ্রহণ করিয়াছেন এবং খুশী হইয়া রাজ-হস্তের বহুমূল্য অঙ্গুরী পুরস্কার করিয়াছেন।

আনন্দে মা-শোয়ের চোখে জল আসিল, সে তাহার পাশে দাঁড়াইয়া মৃদুকণ্ঠে কহিল, বা-থিন, জগতে তুমি সকলের বড় চিত্রকর হইবে।

বা-থিন হাসিল, কহিল, বাবার ঋণ বোধ হয় পরিশোধ করিতে পারিব।

উত্তরাধিকার-সূত্রে মা-শোয়েই তাহার একমাত্র মহাজন। তাই এ কথায় সে সকলের চেয়ে বেশী লজ্জা পাইত। বলিল, তুমি বার বার এমন করিয়া খোঁটা দিলে আর আমি তোমার কাছে আসিব না।

বা-থিন চুপ করিয়া রহিল। কিন্তু ঋণের দায়ে পিতার মুক্তি হইবে না, এত বড় বিপত্তির কথা স্মরণ করিয়া তাহার সমস্ত অন্তরটা যেন শিহরিয়া উঠিল।

বা-থিনের পরিশ্রম আজকাল অত্যন্ত বাড়িয়াছে জাতক হইতে একখানা নূতন ছবি আঁকিতেছিল, আজ সারাদিন মুখ তুলিয়া চাহে নাই।

মা-শোয়ে প্রত্যহ যেমন আসিত, আজিও তেমনি আসিয়াছিল। বা-থিনের শোবার ঘর, বসিবার ঘর, ছবি আঁকিবার ঘর—সমস্ত নিজের হাতে সাজাইয়া গুছাইয়া যাইত। চাকর-দাসীর উপর এ কাজটির ভার দিতে তাহার কিছুতেই সাহস হইত না।

সম্মুখে একখানা দর্পণ ছিল, তাহারই উপর বা-থিনের ছায়া পড়িয়াছিল। মা-শোয়ে অনেকক্ষণ পর্যন্ত একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া হঠাৎ একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, বা-থিন, তুমি আমাদের মত মেয়েমানুষ হইলে এতদিন দেশের রানী হইতে পারিতে।

বা-থিন মুখ তুলিয়া হাসিমুখে বলিল, কেন বল ত?

রাজা তোমাকে বিবাহ করিয়া সিংহাসনে লইয়া যাইতেন। তাঁর অনেক রানী, কিন্তু এমন রঙ, এমন চুল, এমন মুখ কি তাঁদের

কারও আছে? এই বলিয়া সে কাজে মন দিল, কিন্তু বা-থিনের মনে পড়িতে লাগিল, মান্দালেতে সে যখন ছবি আঁকা শিখিতেছিল, তখনও এমনি কথা তাহাকে মাঝে মাঝে শুনিতে হইত।

তখন সে হাসিয়া কহিল, কিন্তু রূপ চুরি করার উপায় থাকিলে তুমি বোধ হয় আমাকে ফাঁকি দিয়া এতদিনে রাজার বামে গিয়া বসিতে।

মা-শোয়ে এই অভিযোগের কোন উত্তর দিল না, কেবল মনে মনে বলিল, তুমি নারীর মত দুর্বল, নারীর মত কোমল, তাহাদের মতই সুন্দর—তোমার রূপের সীমা নাই।

এই রূপের কাছে সে আপনাকে বড় ছোট মনে করিত।

॥ তিন ॥

বসন্তের প্রারম্ভে এই ইমেদিন গ্রামে প্রতি বৎসর অত্যন্ত সমারোহের সহিত ঘোড়দৌড় হইত। আজ সেই উপলক্ষে গ্রামান্তের মাঠে বহু জনসমাগম হইয়াছিল।

মা-শোয়ে ধীরে ধীরে বা-থিনের পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইল। সে একমনে ছবি আঁকিতেছিল, তাই তাহার পদশব্দ শুনিতে পাইল না।

মা-শোয়ে কহিল, আমি আসিয়াছি, ফিরিয়া দেখ।

বা-থিন চকিত হইয়া ফিরিয়া চাহিল, বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, হঠাৎ এত সাজসজ্জা কিসের?

বাঃ, তোমার বুঝি মনে নাই, আজ আমাদের ঘোড়দৌড়? যে জয়ী হইবে সে ত আজ আমাকেই মালা দিবে!

কৈ তা ত শুনি নাই, বলিয়া বা-থিন তাহার তুলিটা পুনরায়

তুলিয়া লইতে যাইতেছিল, মা-শোয়ে তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, না শুনিয়াছ নেই-নেই। কিন্তু তুমি ওঠ—আর কত দেরি করিবে?

এই দুটিতে প্রায় সমবয়সী—হয়ত বা-থিন দুই-চারি মাসের বড় হইতেও পারে, কিন্তু শিশুকাল হইতে এমনি করিয়াই তাহারা এই উনিশটা বছর কাটাইয়া দিয়াছে। খেলা করিয়াছে, বিবাদ করিয়াছে মারপিট করিয়াছে—আর ভালবাসিয়াছে।

সম্মুখে প্রকাণ্ড মুকুরে দুটি মুখ ততক্ষণ দুটি প্রস্ফুটিত গোলাপের মত ফুটিয়া উঠিয়াছিল. বা-থিন দেখাইয়া কহিল, ঐ দেখ—

মা-শোয়ে কিছুক্ষণ নীরবে ঐ দুটি ছবির পানে অতৃপ্ত-নয়নে চাহিয়া রহিল। অকস্মাৎ আজ প্রথম তাহার মনে হইল, সেও বড় সুন্দর। আবেশে দুই চক্ষু তাহার মুদিয়া আসিল. কানে কানে বলিল. আমি যেন চাঁদের কলঙ্ক।

বা-থিন আরও কাছে তাহার মুখখানি টানিয়া আনিয়া বলিল, না, তুমি চাঁদের কলঙ্ক নও—তুমি কাহারও কলঙ্ক নয়,—তুমি চাঁদের কৌমুদিটি। একবার ভাল করিয়া চাহিয়া দেখ।

কিন্তু নয়ন মেলিতে মা-শোয়ের সাহস হইল না, সে তেমনি দু'-চক্ষু মুদিয়া রহিল।

হয়ত এমনি করিয়াই বহুক্ষণ কাটিত, কিন্তু একটা প্রকাণ্ড নর-নারীর দল নাচিয়া গাহিয়া সুমুখের পথ দিয়া উৎসবে যোগ দিতে চলিয়াছিল। মা-শোয়ে ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, চল, সময় হইয়াছে।

কিন্তু আমার যাওয়া যে একেবারে অসম্ভব মা-শোয়ে।

কেন?

এই ছবিখানি পাঁচদিনে শেষ করিয়া দিব চুক্তি করিয়াছি।

না দিলে?

সে মান্দালে চলিয়া যাইবে, সুতরাং ছবিও লইবে না, টাকাও দিবে না।

টাকার উল্লেখে মা-শোয়ে কষ্ট পাইত, লজ্জাবোধ করিত। রাগ করিয়া বলিল, কিন্তু তা বলিয়া ত তোমাকে এমন প্রাণপাত পরিশ্রম করিতে দিতে পারি না।

বা-থিন এ কথার উত্তর দিল না। পিতৃঋণ স্মরণ করিয়া তাহার মুখের উপর যে ম্লান ছায়া পড়িল, তাহা আর একজনের দৃষ্টি এড়াইল না। কহিল, আমাকে বিক্রি করিও, আমি দ্বিগুণ দাম দিব।

বা-থিনের তাহাতে সন্দেহ ছিল না, হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু করিবে কি?

মা-শোয়ে গলার বহুমূল্য হার দেখাইয়া বলিল, ইহাতে যতগুলি মুক্তা, যতগুলি চুনি আছে সবগুলি দিয়া ছবিটিকে বাঁধাইব, তার পরে শোবার ঘরে আমার চোখের উপর টাঙাইয়া রাখিব।

তারপর?

তার পরে যেদিন রাত্রে খুব বড় চাঁদ উঠিবে, আর খোলা জানালার ভিতর দিয়া তাহার জোৎস্নার আলো তোমার ঘুমন্ত মুখের উপর খেলা করিতে থাকিবে—

তার পরে?

তারপরে তোমার ঘুম ভাঙ্গিয়ে—

কথাটা শেষ হইতে পাইল না। নীচে মা-শোয়ের গরুর গাড়ি অপেক্ষা করিতেছিল, তাহার গাড়োয়ানের উচ্চকণ্ঠের আহ্বান শোনা গেল।

বা-থিন ব্যস্ত হইয়া কহিল, তার পরের কথা পরে শুনিব, কিন্তু আর নয়। তোমার সময় হইয়া গেছে—শীঘ্র যাও।

কিন্তু সময় বহিয়া যাইবার কোন লক্ষণ মা-শোয়ের আচরণে দেখা গেল না। কারণ সে আরও ভাল করিয়া বসিয়া কহিল, আমার

শরীর খারাপ বোধ হইতেছে, আমি যাবো না।

যাবে না? কথা দিয়াছ, সকলে উদ্‌গ্রীব হইয়া তোমার প্রতীক্ষা করিতেছে, তা জানো?

মা-শোয়ে প্রবলবেগে মাথা নাড়িয়া কহিল, তা করুক। চুক্তি-ভঙ্গের অত লজ্জা আমার নাই—আমি যাবো না!

ছিঃ—

তবে তুমিও চল!

পারিলে নিশ্চয় যাইতাম, কিন্তু তাই বলিয়া আমার জন্য তোমাকে আমি সত্যভঙ্গ করিতে দিব না। আর দেরি করিও না, যাও।

তাহার গম্ভীর মুখ ও শান্ত দৃঢ় কণ্ঠস্বর শুনিয়া মা-শোয়ে উঠিয়া দাঁড়াইল। অভিমানে মুখখানি ম্লান করিয়া কহিল, তুমি নিজের সুবিধার জন্য আমাকে দূর করিতে চাও। দূর আমি হইতেছি, কিন্তু আর কখনও তোমার কাছে আসিব না!

একমুহূর্ত বা-থিনের কর্তব্যের দৃঢ়তা স্নেহের জলে গলিয়া গেল, সে তাহাকে কাছে টানিয়া লইয়া সহাস্যে কহিল, এতবড় প্রতিজ্ঞাটা করিয়া বসিও না মা-শোয়ে—আমি জানি, ইহার শেষ কি হইবে। কিন্তু আর ত বিলম্ব করা চলে না।

মা-শোয়ে তেমনি বিষন্নমুখেই উত্তর দিল, আমি না আসিলে খাওয়া-পরা, হইতে আরম্ভ করিয়া সকল বিষয়ে তোমার যে দশা হইবে, সে আমি সহিতে পারিব না জানো বলিয়াই আমাকে তুমি তাড়াইতে পারিলে। এই বলিয়া সে প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই দ্রুতপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

॥ চার ॥

প্রায় অপরাহ্নবেলায় মা-শোয়ের রূপা-বাঁধানো 'ময়ূরপঙ্খী' গোযান যখন ময়দানে আসিয়া পৌঁছিল, তখন সমবেত জনমণ্ডলী প্রচণ্ড কলরবে কোলাহল করিয়া উঠিল।

সে যুবতী, সে সুন্দরী, সে অবিবাহিতা, এবং বিপুল ধনে অধিকারিণী। মানবের যৌবন-রাজ্যে তাহার স্থান অতি উচ্চে। তাই এখানেও বহু মানের আসনটি তাহারই জন্য নির্দিষ্ট হইয়াছিল। সে আজ পুষ্পমাল্য বিতরণ করিবে। তাহার পর যে ভাগ্যবান এই রমণীর শিরে জয়মাল্যটি সর্বাগ্রে পরাইয়া দিতে পারিবে, তাহার অদৃষ্টই আজ যেন জগতে হিংসা করিবার একমাত্র বস্তু।

সজ্জিত অশ্বপৃষ্ঠে রক্তবর্ণ পোশাকে সওয়ারগণ উৎসাহ ও চাঞ্চল্যের আবেগ কষ্টে সংযত করিয়া ছিল। দেখিলে মনে হয়, আজ সংসারে তাহাদের অসাধ্য কিছু নাই।

ক্রমশঃ সময় আসন্ন হইয়া আসিল, এবং যে কয়জন অদৃষ্ট পরীক্ষা করিতে আজ উদ্যত, তাহারা সারি দিয়া দাঁড়াইল এবং ক্ষণেক পরেই ঘণ্টার সঙ্গে সঙ্গে মরি-বাঁচি-জ্ঞানশূন্য হইয়া কয়জন ঘোড়া ছুটাইয়া দিল।

ইহা বীরত্ব, ইহা যুদ্ধের অংশ। মা-শোয়ের পিতৃপিতামহগণ সকলেই যুদ্ধব্যবসায়ী, ইহার উন্মত্ত বেগ নারী হইলেও তাহার ধমনীতে বহমান ছিল। যে জয়ী হইবে, তাহাকে সমস্ত হৃদয় দিয়া সংবর্ধনা না করিবার সাধ্য তাহার ছিল না।

তাই যখন ভিন্ন-গ্রামবাসী এক অপরিচিত যুবক আরক্তদেহে,

কম্পিত-মুখে, ক্লেদসিক্ত হস্তে তাহার শিরে জয়মাল্য পরাইয়া দিল, তখন তাহার আগ্রহের আতিশয্য অনেক সম্ভ্রান্ত রমণীর চক্ষেই কটু বলিয়া ঠেকিল।

ফিরিবার পথে সে তাহাকে আপনার পার্শ্বে গাড়িতে স্থান দিল এবং সজলকণ্ঠে কহিল, আপনার জন্য আমি বড় ভয় পাইয়াছিলাম। একবার এমনও মনে হইয়াছিল, অত বড় উঁচু প্রাচীর, কোনরূপে যদি কোথাও পা ঠেকিয়া যায়।

যুবক বিনয়ে ঘাড় হেঁট করিল, কিন্তু এই অসমসাহসী বলিষ্ঠ বীরের সহিত মা-শোয়ে মনে মনে তাহার সেই দুর্বল, কোমল ও সর্ববিষয়ে অপটু চিত্রকরের সহিত তুলনা না করিয়া পারিল না।

এই যুবকটির নাম পো-থিন। কথায় কথায় পরিচয় হইলে জানা গেল, ইনিও উচ্চবংশীয়, ইনিও ধনী এবং তাহাদেরই দূর-আত্মীয়।

মা-শোয়ে আজ অনেককেই তাহার প্রাসাদে সান্ধ্যভোজে নিমন্ত্রণ করিয়াছিল, তাহারা এবং আরও বহু লোক ভিড় করিয়া গাড়ির সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছিল। আনন্দের আগ্রহে, তাহাদের তাণ্ডব-নৃত্যোত্থিত ধুলার মেঘে ও সঙ্গীতের অসহ্য নিনাদে সন্ধ্যার আকাশ তখন একেবারে আচ্ছন্ন অভিভূত হইয়া পড়িতেছিল।

এই ভয়ঙ্কর জনতা যখন তাহার বাটীর সুমুখ দিয়া অগ্রসর হইয়া গেল, তখন ক্ষণকালের নিমিত্ত বা-থিন তাহার কাজ ফেলিয়া জানালায় আসিয়া নীরবে চাহিয়া রহিল।

॥ পাঁচ ॥

সান্ধ্যভোজের প্রসঙ্গে পরদিন মা-শোয়ে বা-থিনকে কহিল, কাল সন্ধ্যাটা আনন্দে কাটিল। অনেকেই দয়া করিয়া আসিয়াছিলেন। শুধু তোমার সময় ছিল না বলিয়া তোমাকে ডাকি নাই।

সেই ছবিটা সে প্রাণপণে, শেষ করিতেছিল. মুখ না তুলিয়াই, বলিল, ভালই করিয়াছিলে। এই বলিয়া সে কাজ করিতে লাগিল।

বিস্ময়ে মা-শোয়ে স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিল। কথার ভারে তাহার পেট ফুলিতেছিল. কাল বা-থিন কাজের চাপে উৎসবে যোগ দিতে পারে নাই, তাই আজ অনেকক্ষণ ধরিয়া অনেক গল্প করিবে মনে করিয়াই সে আসিয়াছিল, কিন্তু সমস্তই উলটা রকমের হইয়া গেল। কেবল একা একা প্রলাপ চলিতে পারে. কিন্তু আলাপের কাজ চলে না. তাই সে শুধু স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল, কিছুতেই অপর পক্ষের প্রবল ঔদাস্য ও গভীর নীরবতার রুদ্ধদ্বার ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে আজ ভরসা করিল না। প্রতিদিন যে-সকল ছোট-খাটো কাজগুলি সে করিয়া যায়, আজ সেগুলিও পড়িয়া রহিল—কিছুতেই হাত দিতে তাহার প্রবৃত্তি হইল না। এইভাবে অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল. একবার বা-থিন মুখ তুলিল না. একবার একটা প্রশ্ন করিল না। কালকের অতবড় ব্যাপারের প্রতিও তাহার যেমন লেশমাত্র কৌতূহল নাই, কাজের ফাঁকে হাঁফ ফেলিবারও তাহার তেমনি অবসর নাই।

বহুক্ষণ পর্যন্ত নিঃশব্দে কুণ্ঠিত ও লজ্জিত হইয়া থাকিয়া অবশেষে সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া মৃদুকণ্ঠে কহিল, আজ আসি।

বা-থিন ছবির উপর চোখ রাখিয়াই বলিল, এসো।

যাবার সময় মা-শোয়ের মনে হইল. যেন সে এই লোকটির অন্তরের কথাটা বুঝিয়াছে। জিজ্ঞাসা করে. একবার সে ইচ্ছাও হইল বটে, কিন্তু মুখ খুলিতে পারিল না, নীরবেই বাহির হইয়া গেল।

বাটীতে পা দিয়াই দেখিল. পো-থিন বসিয়া আছে। গতরাত্রির আনন্দ-উৎসবের জন্য ধন্যবাদ দিতে আসিয়াছিল। অতিথিকে মা-

শোয়ে যত্ন করিয়া বসাইল।

লোকটা প্রথমে মা-শোয়ের ঐশ্বর্যের কথা তুলিল, পরে তাহার বংশের কথা তাহার পিতার খ্যাতির কথা, তাহার রাজদ্বারে সম্ভ্রমের কথা—এমনি কত কি সে অনর্গল বকিয়া যাইতে লাগিল।

এ-সকল কতক বা সে শুনিল, কতক বা তাহার অন্যমনস্ক কানে পৌঁছিল না। কিন্তু লোকটা শুধু বলিষ্ঠ এবং অতি সাহসী ঘোড়সওয়ারই নয়, সে অত্যন্ত ধূর্ত। মা-শোয়ের এই ঔদাসীন্য তাহার অগোচর রহিল না। সে মান্দালের রাজ-পরিবারের প্রসঙ্গ তুলিয়া অবশেষে যখন সৌন্দর্যের আলোচনা শুরু করিল এবং কৃত্রিম সারল্যে পরিপূর্ণ হইয়া এই রমণীকে লক্ষ্য এবং উপলক্ষ্য করিয়া বারংবার তাহার রূপ ও যৌবনের ইঙ্গিত করিতে লাগিল, তখন তাহার মনে মনে অতিশয় লজ্জা করিতে লাগিল, বটে, কিন্তু একটা অপরূপ আনন্দ ও গৌরব অনুভব না করিয়াও থাকিতে পারিল না। এবং আলাপ শেষ হইলে পো-থিন বিদায় গ্রহণ করিল, তখন আজিকার রাত্রির জন্যও সে আহারের নিমন্ত্রণ লইয়া গেল।

কিন্তু চলিয়া গেলে, তাহার কথাগুলা মনে মনে আবৃত্তি করিয়া মা-শোয়ের সমস্ত মন ছোট এবং গ্লানিতে ভরিয়া উঠিল এবং নিমন্ত্রণ করিয়া ফেলার জন্য বিরক্তি ও বিতৃষ্ণার অবধি রহিল না। সে তাড়াতাড়ি আরও জন-কয়েক বন্ধু-বান্ধবকে নিমন্ত্রণ করিয়া চাকর দিয়া চিঠি পাঠাইয়া দিল। অতিথিরা যথাসময়েই হাজির হইলেন এবং আজও অনেক হাস-তামাশা, অনেক গল্প, অনেক নৃত্যগীতের সঙ্গে যখন খাওয়াদাওয়া শেষ হইল, তখন রাত্রি আর বড় বাকি নাই।

ক্লান্ত পরিশ্রম হইয়া সে শুইতে গেল, কিন্তু চোখে ঘুম আসিল না। কিন্তু বিস্ময় এই যে, যাহা লইয়া তাহার এতক্ষণ এমন করিয়া কাটিল, তাহার একটা কথাও আর মনে আসিল না। সে-সকল

যেন কত যুগের পুরানো অকিঞ্চিৎকর ব্যাপার—এমনি শুষ্ক, এমনি বিরস। তাহার কেবলি মনে পড়িতে লাগিল আর একটা লোককে, যে তাহারই উদ্যানপ্রান্তের একটা নির্জন গৃহে এখন নির্বিঘ্নে আছে,—আজিকার এতবড় মাতামাতির লেশমাত্রও তাহার কানে যাইবার হয়ত এতটুকু পথও কোথাও খুঁজিয়া পাও নাই।

॥ ছয় ॥

চিরদিনের অভ্যাস, প্রভাত হইতেই মা-শোয়েকে টানিতে লাগিল। আবার সে গিয়া বা-থিনের ঘরে আসিয়া বসিল।

প্রতিদিনের মত আজিও সে কেবল একটা 'এসো' বলিয়াই তাহার সহজ অভ্যর্থনা শেষ করিয়া কাজে মন দিল; কিন্তু কাছে বসিয়াও আর একজনের আজ কেবলি মনে হইতে লাগিল, ওই কর্মনিরত নীবব লোকটি নীরবেই যেন বহুদূরে সরিয়া গিয়াছে।

অনেকক্ষণ পর্যন্ত মা-শোয়ে কথা খুঁজিয়া পাইল না। তার পরে সঙ্কোচ কাটাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, তোমার আর বাকী কত?

অনেক।

তবে, এই দুদিন ধরিয়া কি করিলে?

বা-থিন ইহার জবাব না দিয়া চুরুটের বাক্সটা তাহার দিকে বাড়াইয়া দিয়া বলিল, এই মদের গন্ধটা আমি সইতে পারি না।

মা-শোয়ে এই ইঙ্গিত বুঝিল। জ্বলিয়া উঠিয়া হাত দিয়া বাক্সটা সজোরে ঠেলিয়া দিয়া বলিল, আমি সকালবেলা চুরুট খাই না—চুরুট দিয়া গন্ধ ঢাকিবার কাজও করি নাই—আমি ছোটলোকের মেয়ে নই।

বা-থিন মুখ তুলিয়া শান্তকণ্ঠে কহিল, হয়ত তোমার জামা-

কাপড়ে কোনরূপে লাগিয়াছে, মদের গন্ধটা আমি বানাইয়া বলি নাই।

মা-শোয়ে বিদ্যুদ্বেগে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, তুমি যেমন নীচ তেমনি হিংসুক, তাই আমাকে বিনাদোষে অপমান করিলে। আচ্ছা, তাই ভাল, আমার জামা-কাপড় তোমার ঘর থেকে আমি চিরকালের জন্য সরাইয়া লইয়া যাইতেছি। এই বলিয়া সে প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই দ্রুতবেগে ঘর ছাড়িয়া যাইতেছিল, বা-থিন পিছনে ডাকিয়া তেমনি সংযত-স্বরে বলিল, আমাকে নীচ ও হিংসুক কেহ কখনও বলে নাই, তুমি হঠাৎ অধঃপথে যাইতে উদ্যত হইয়াছ বলিয়াই সাবধান করিয়াছি।

মা-শোয়ে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, অধঃপথে কি করিয়া গেলাম?

তাই আমার মনে হয়।

আচ্ছা, এই মন লইয়াই থাকো, কিন্তু যাহার পিতা আশীর্বাদ রাখিয়া গেছেন, সন্তানের জন্য অভিশাপ রাখিয়া যান নাই, তাহার সঙ্গে তোমার মনের মিল হইবে না।

এই বলিয়া সে চলিয়া গেল, কিন্তু বা-থিন স্থির হইয়া বসিয়া রহিল। কেহ যে কোন কারণেই কাহাকে এমন মর্মান্তিক করিয়া বিঁধিতে পারে, এত ভালবাসা একদিনেই যে এতবড় বিষ হইয়া উঠিতে পারে, ইহা সে ভাবিতেও পারিত না।

মা-শোয়ে বাটী আসিয়াই দেখিল, পো-থিন বসিয়া আছে। সে সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইয়া অত্যন্ত মধুর করিয়া একটি হাস্য করিল।

হাসি দেখিয়া মা-শোয়ের দুই ভ্রূ বোধ করি অজ্ঞাতসারেই কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। কহিল, আপনার কি বিশেষ কোন প্রয়োজন আছে?

না. প্রয়োজন এমন—

তা হলে আমার সময় হবে না, বলিয়া পাশের সিঁড়ি দিয়া মা-শোয়ে উপরে চলিয়া গেল।

গত-নিশার কথা স্মরণ করিয়া লোকটা একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেল। কিন্তু বেহারাটা সুমুখে আসিতেই কাষ্ঠহাসির সঙ্গে হাতে তাহার একটা টাকা গুঁজিয়া দিয়া শিস দিতে দিতে বাহির হইয়া গেল।

॥ সাত ॥

শিশুকাল হইতে যে দুইজনের কখনও একমুহূর্তের জন্য বিচ্ছেদ ঘটে নাই, অদৃষ্টের বিড়ম্বনায় আজ মাসাধিক কাল গত হইয়াছে, কাহারও সহিত কেহ সাক্ষাৎ করে নাই।

মা-শোয়ে এই বলিয়া আপনাকে বুঝাইবার চেষ্টা করে যে, এ একপ্রকার ভালোই যে. যে মোহের জাল এই দীর্ঘদিন ধরিয়া তাহাকে কঠিন বন্ধনে অভিভূত করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। আর তাহার সহিত বিন্দুমাত্র সংস্রব নাই। এই ধনীর কন্যার নবীন উদ্দাম প্রকৃতি পিতা বিদ্যমানেও অনেকদিন এমন অনেক কাজ করিতে চাহিয়াছে. যাহা কেবলমাত্র গম্ভীর ও সংযত-চিত্ত বা-থিনের বিরক্তির ভয়েই পারে নাই। কিন্তু আজ সে স্বাধীন—একেবারে নিজের মালিক নিজে। কোথাও কাহারো কাছে আর লেশমাত্র জবাবদিহি করিবার নাই। এই একটিমাত্র কথা লইয়া সে মনে মনে অনেক তোলাপাড়া, অনেক ভাঙ্গা-গড়া করিয়াছে, কিন্তু একটা দিনের জন্যও কখনো আপনার হৃদয়ের নিগূঢ়তম গৃহটির দ্বার খুলিয়া দেখে নাই, সেখানে কি আছে। দেখিলে দেখিতে পাইত

এতদিন শুধুমাত্র সে আপনাকেই আপনি ঠকাইয়াছে। সেই নিভৃত গোপন-কক্ষে দিবানিশি উভয়ে মুখোমুখি বসিয়া আছে—প্রেমালাপ করিতেছে না, কলহ করিতেছে না—কেবল নিঃশব্দে উভয়ের চক্ষু বাহিয়া অশ্রু বহিয়া যাইতেছে।

নিজেদের জীবনের এই একান্ত করুণ চিত্রটি তাহার মনশ্চক্ষের অগোচর ছিল বলিয়াই ইতিমধ্যে গৃহে তাহার অনেক উৎসব-রজনীর নিষ্ফল অভিনয় হইয়া গেল—পরাজয়ের লজ্জা তাহাকে ধূলির সঙ্গে মিশাইয়া দিল না।

কিন্তু আজিকার দিনটা ঠিক তেমনি করিয়া কাটিতে চাহিল না ; কেন, সেই কথাটাই বলিব।

জন্মতিথি উপলক্ষে প্রতি বৎসর তাহার গৃহে একটা আমোদ-আহ্লাদ ও খাওয়া-দাওয়ার অনুষ্ঠান হইত। আজ সেই আয়োজন-টাই কিছু অতিরিক্ত আড়ম্বরের সহিত হইতেছিল। বাটীর দাসদাসী হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতিবেশীরা পর্যন্ত আসিয়া যোগ দিয়াছে, কেবল তাহার নিজেরই যেন কিছুতে গা নাই। সকাল হইতে আজ তাহার মনে হইতে লাগিল, সমস্ত বৃথা, সমস্ত পণ্ডশ্রম। কেমন করিয়া যেন এতদিন তাহার মনে হইতেছিল, ওই লোকটাও দুনিয়ার অপর সকলেরই মত সেও মানুষ সেও ঈর্ষার অতীত নয়। তাহার গৃহের এই যে সব আনন্দ-উৎসবের অপর্যাপ্ত ও নব নব আয়োজন, ইহার বার্তা কি তাহার রুদ্ধ বাতায়ন ভেদিয়া সেই নিভৃত কক্ষে গিয়া পশে না? তাহার কাজের মধ্যে কি বাধা দেয় না?

হয়তবা সে তাহার তুলিটা ফেলিয়া দিয়া কখনও স্থির হইয়া বসে, কখনও বা অস্থির দ্রুতপদে ঘরের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়ায়, কখনও বা নিদ্রাবিহীন তপ্ত শয্যায় পড়িয়া সারারাত্রি জ্বলিয়া পুড়িয়া মরে, কখনও বা—কিন্তু থাক সে-সব!

কল্পনায় এতদিন মা-শোয়ে একপ্রকার তীক্ষ্ণ আনন্দ অনুভব

করিতেছিল, কিন্তু আজ তাহার হঠাৎ মনে হইতেছিল, কিছুই না—কিছুই না। তাহার কোন কাজেই তাহার কোন বিঘ্ন ঘটায় না! সমস্ত মিথ্যা, সমস্ত ফাঁকি। সে ধরিতেও চাহে না—ধরা দিতেও চাহে না। ওই দুর্বল দেহটা অকস্মাৎ কি করিয়া যেন একেবারে পাহাড়ের মত কঠিন ও অচল হইয়া গেছে—কোথাকার কোন ঝঞ্ঝাই আর তাহাকে একবিন্দু বিচলিত করিতে পারে না।

কিন্তু তথাপি জন্মতিথি-উৎসবের বিরাট আয়োজন আড়ম্বরের সঙ্গেই চলিতেছিল। পো-থিন আজ সর্বত্র, সকল কাজে। এমন কি, পরিচিতদের মধ্যে একটা কানাঘুষাও চলিতেছিল যে একদিন এই লোকটাই এ বাড়ির কর্তা হইয়া উঠিবে—এবং বোধ হয়, সেদিন বড় বেশী দূরেও নয়।

গ্রামের নরনারীতে বাড়ি পরিপূর্ণ হইয়া গেছে—চারিদিকেই আনন্দ-কলরব। শুধু যাহার জন্য এই-সব সেই মানুষটিই বিমনা—তাহারই মুখ নিরানন্দের ছায়ায় আচ্ছন্ন। কিন্তু এই ছায়া বাহিরের কাহারো চোখেই প্রায় পড়িল না—পড়িল কেবল বাটীর দুই-একজন সাবেক দিনের দাস-দাসীর। আর পড়িল বোধ হয় তাঁহার—যিনি অলক্ষ্যে থাকিয়াও সমস্ত দেখেন। কেবল তিনিই দেখিতে লাগিলেন, ওই মেয়েটির কাছে আজ সমস্তই শুধু বিড়ম্বনা। এই জন্মতিথির দিনে প্রতিবৎসর যে লোকটি সকলের আগে গোপনে তাহার গলায় আশীর্বাদের মালা পরাইয়া দিত, আজ সে-লোক নাই, সে-মালা নাই, সে-আশীর্বাদের আজ একান্ত অভাব।

মা-শোয়ের পিতার আমলের বৃদ্ধ আসিয়া কহিল, ছোটমা কৈ তাহাকে ত দেখি না?

বুড়া কিছুকাল পূর্বে কর্মে অবসর লইয়া চলিয়া গিয়াছিল, তাহার ঘরও অন্য গ্রামে—এই মনান্তরের খবর সে জানিতো না। আজ আসিয়া চাকর-মহলে শুনিয়াছে। মা-শোয়ে উদ্ধতভাবে বলিল,

দেখিবার দরকার থাকে তাহার বাড়ি যাও—আমার এখানে কেন ?

বেশ, তাই যাইতেছি, বলিয়া বৃদ্ধ চলিয়া গেল। মনে মনে বলিয়া গেল, কেবল তাঁকে একাকী দেখলেই ত চলিবে না—তোমাদের দু'জনকে আমার এক সঙ্গে দেখা চাই। নইলে এতটা পথ বৃথাই হাঁটিয়া আসিয়াছি।

কিন্তু বুড়ার মনের কথাটি এই নবীনার অগোচর রহিল না। সেই অবধি একপ্রকার সচকিত অবস্থাতেই তাহার সকল কাজের মধ্যে সময় কাটিতেছিল, সহসা একটা চাপা-গলার অস্ফুট শব্দে চাহিয়া দেখিল—বা-থিন। তাহার সর্বাঙ্গ দিয়া বিদ্যুৎ বহিয়া গেল, কিন্তু চক্ষের নিমেষে আপনাকে সংবরণ করিয়া লইয়া সে মুখ ফিরাইয়া অন্যত্র চলিয়া গেল।

খানিক পরে বুড়া আসিয়া কহিল, ছোটমা, যাই হোক, তোমার অতিথি। একটা কথাও কি কহিতে নাই ?

কিন্তু তোমাকে ত আমি ডাকিয়া আনিতে বলি নাই ?

সেইটাই আমার অপরাধ হইয়া গেছে, বলিয়া সে চলিয়া যাইতেছিল, মা-শোয়ে ডাকিয়া কহিল, বেশ ত, আমি ছাড়া আরও ত লোক আছেন, তাঁরা ত কথা বলিতে পারেন !

বুড়া বলিল, তা পারেন, কিন্তু আর আবশ্যক নাই, তিনি চলিয়া গেছেন।

মা-শোয়ে ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া রহিল। তার পরে কহিল, আমার কপাল ! নইলে তুমিও ত তাঁকে খাইয়া যাইবার কথাটা বলিতে পারিতে !

না, আমি এত নির্লজ্জ নই, বলিয়া বুড়া রাগ করিয়া চলিয়া গেল।

॥ আট ॥

এই অপমানে বা-থিনের চোখে জল আসিল। কিন্তু সে কাহাকেও দোষ দিল না, কেবল আপনাকে বারংবার ধিক্কার দিয়া কহিল, এ ঠিকই হইয়াছে। আমার মত লজ্জাহীনের ইহারই প্রয়োজন ছিল।

কিন্তু প্রয়োজন যে ঐখানেই—ঐ একটা রাত্রির ভিতর দিয়াই শেষ হয় নাই, ইহার চেয়ে অনেক—অনেক বেশী অপমান যে তাহার অদৃষ্টে ছিল, ইহা দিন-দুই পরে টের পাইল, আর এমন করিয়া টের পাইল যে, সে-লজ্জা সারাজীবনে কোথায় রাখিবে, তাহার কূলকিনারা দেখিল না।

যে ছবিটার কথা লইয়া এই আখ্যায়িকা আরম্ভ হইয়াছে, জাতকের সেই গোপার চিত্রটা এতদিনে সম্পূর্ণ হইয়াছে। এক-মাসের অধিক কাল অবিশ্রান্ত পরিশ্রমের ফল আজ শেষ হইয়াছে। সমস্ত সকালটা সে এই আনন্দেই মগ্ন হইয়া রহিল।

ছবি রাজ-দরবারে যাইবে, যিনি দাম দিয়া লইয়া যাইবেন, সংবাদ পাইয়া তিনি উপস্থিত হইলেন। কিন্তু ছবির আবরণ উন্মুক্ত হইলে তিনি চমকিয়া গেলেন। চিত্র-সম্বন্ধে তিনি আনাড়ী ছিলেন না; অনেকক্ষণ একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া অবশেষে ক্ষুব্ধস্বরে বলিলেন, এ ছবি আমি রাজাকে দিতে পারিব না।

বা-থিন ভয়ে বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া কহিল, কেন?

তার কারণ এ মুখ আমি চিনি। মানুষের চেহারা দিয়া দেবতা গড়িলে দেবতাকে অপমান করা হয়। এ কথা ধরা পড়িলে রাজা আমার মুখ দেখিবেন না। এই বলিয়া সে চিত্রকরের বিস্ফারিত

ব্যাকুল চক্ষের প্রতি ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল, একটু মন দিয়া দেখিলেই দেখিতে পাইবেন—এ কে। এ ছবি চলিবে না।

বা-থিনের চোখের উপর হইতে ধীরে ধীরে একটা কুয়াশার ঘোর কাটিয়া যাইতেছিল। ভদ্রলোক চলিয়া গেলেও সে তেমনি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল, আর তাহার বুঝিতে বাকী নাই. এতদিন এই প্রাণান্ত পরিশ্রম করিয়া সে হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে যে সৌন্দর্য যে মাধুর্য বাহিরে টানিয়া আনিয়াছে, দেবতার রূপে যে তাহাকে অহর্নিশি ছলনা করিয়াছে—সে জাতকের গোপা নহে, সে তাহার-ই মা-শোয়ে।

চোখ মুছিয়া মনে মনে কহিল, ভগবান! আমাকে এমন করিয়া বিড়ম্বিত করিলে—তোমার আমি কি করিয়াছিলাম।

।। নয় ।।

পো-থিন সাহস পাইয়া বলিল, তোমাকে দেবতাও কামনা করেন মা-শোয়ে, আমি ত মানুষ!

মা-শোয়ে অন্যমনস্কের মত উত্তর দিল, কিন্তু যে করে না, সে বোধ হয় তবে দেবতারও বড়।

কিন্তু এ প্রসঙ্গকে সে আর অগ্রসর হইতে দিল না, কহিল, শুনিয়াছি, দরবারে আপনার যথেষ্ট প্রতিপত্তি আছে—আমার একটা কাজ করিয়ে দিতে পারেন? খুব শীঘ্র?

পো-থিন উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল. কি?

একজনের কাছে আমি অনেক টাকা পাই, কিন্তু আদায় করিতে

প্যাবি না। কোন দলিল নাই। আপনি কিছু উপায় করিতে পারেন?

পারি। কিন্তু তুমি কি জানো না, এই রাজ কর্মচারীটি কে? বলিয়া লোকটা হাসিল।

এই হাসির মধ্যেই স্পষ্ট উত্তর ছিল। মা-শোয়ে ব্যগ্র হইয়া তাহার হাতটা চাপিয়া ধরিয়া বলিল, তবে দিন একটি উপায় করিয়া। আজই। আমি একটা দিনও আর বিলম্ব করিতে চাহি না।

পো-থিন ঘাড় নাড়িয়া কহিল বেশ, তাই।

এই ঋণটা চিরদিন এত তুচ্ছ, এত অসম্ভব, এতই হাসির কথা ছিল যে, এসম্বন্ধে কেহ কখনো চিন্তা পর্যন্ত করে নাই। কিন্তু রাজ কর্মচারীর মুখের আশায় মা-শোয়ের সমস্ত দেহ একমুহূর্তে উত্তেজনায় উত্তপ্ত হইয়া উঠিল, সে দুই চক্ষু প্রদীপ্ত করিয়া সমস্ত ইতিহাস বিবৃত করিয়া কহিতে লাগিল, আমি কিছুই ছাড়িয়া দিব না— একটা কড়ি পর্যন্ত না। জোঁক যেমন করিয়া রক্ত শুষিয়া লয়, ঠিক তেমনি করিয়া। আজই—এখনই হয় না?

এ বিষয়ে এই লোকটাকে অধিক বলা বাহুল্য। ইহা তাহার আশার অতীত। সে ভিতরের আনন্দ ও আগ্রহ কোনমতে সংবরণ করিয়া বলিল, রাজার আইন অন্ততঃ সাত দিনের সময় চায়। এ সময়টুকু কোনরূপে ধৈর্য ধরিয়া থাকিতেই হইবে। তাহার পরে যেমন করিয়া খুশী, যত খুশি রক্ত শুষিবেন, আমি আপত্তি করিব না।

সেই ভাল। কিন্তু এখন আপনি যান। এই বলিয়া সে এক প্রকার যেন ছুটিয়া পলাইল।

এই দুর্বোধ মেয়েটির প্রতি লোকটির লোভের অবধি ছিল না! তাই অনেক অবহেলা সে নিঃশব্দে পরিপাক করিত, আজিও করিল;

বরঞ্চ, গৃহে ফিরিবার পথে আজ তাহার পুলকিত চিত্ত পুনঃ পুনঃ এই কথাটাই আপনাকে আপনি কহিতে লাগিল, আর ভয় নাই—তাহার সফলতার পথ নিষ্কণ্টক হইতে আর বোধ হয় অধিক বিলম্ব হইবে না। বিলম্ব হইবে না, সে কথা সত্য। কিন্তু কত শীঘ্র এবং কতবড় বিস্ময় যে ভগবান তাহার অদৃষ্টে লিখিয়া রাখিয়াছিলেন, এ আজ কল্পনা করাও তাহার পক্ষে সম্ভব ছিল না।

॥ দশ ॥

ঋণের দাবীর চিঠি আসিল। কাগজখানা হাতে করিয়া বা-থিন অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। ঠিক এই জিনিসটি সে আশা করে নাই বটে, কিন্তু আশ্চর্যও হইল না। সময় অল্প, শীঘ্র কিছু একটা করা চাই।

একদিন নাকি মা-শোয়ে রাগের উপর তাহার পিতার অপব্যয়ের প্রতি বিদ্রূপ করিয়াছিল, তাহার এ অপরাধ সে বিস্মৃতও হয় নাই, ক্ষমাও করে নাই। তাই সে সময়ভিক্ষার নাম করিয়া আর তাঁহাকে অপমান করিবার কল্পনাও করিল না। শুধু চিন্তা এই যে, তাহার যাহা-কিছু আছে, সব দিয়াও পিতাকে ঋণমুক্ত করা যাইবে কিনা। গ্রামের মধ্যেই একজন ধনী মহাজন ছিল। পরদিন সকালেই সে তাহার কাছে গিয়া গোপনে সর্বস্ব বিক্রি করিবার প্রস্তাব করিল। দেখা গেল, যাহা তিনি দিতে চাহেন, তাহাই যথেষ্ট। টাকাটা সে সংগ্রহ করিয়া ঘরে আনিল, কিন্তু একজনের অকারণ হৃদয়হীনতা যে তাহার সমস্ত দেহমনের উপর অজ্ঞাতসারে কতবড় আঘাত দিয়াছিল, ইহা সে জানিল তখন, যখন জ্বরে পড়িল।

কোথা দিয়া যে দিন-রাত্রি কাটিল, তাহার খেয়াল রহিল না।

জ্ঞান হইলে উঠিয়া বসিয়া দেখিল, সেইদিনই তাহার মেয়াদের শেষ দিন।

আজ শেষ দিন। আপনার নিভৃত কক্ষে বসিয়া মা-শোয়ে কল্পনার জাল বুনিতেছিল। তাহার নিজের অহঙ্কার অনুক্ষণ ঘা খাইয়া খাইয়া আর একজনের অহঙ্কারকে একেবারে অভ্রভেদী উচ্চ করিয়া দাঁড় করাইয়াছিল। সেই বিরাট অহঙ্কার আজ তাহার পদমূলে পড়িয়া যে মাটির সঙ্গে মিশাইবে, ইহাতে তাহার লেশমাত্র সংশয় ছিল না।

এমন সময়ে ভৃত্য আসিয়া জানাইল, নীচে বা-থিন অপেক্ষা করিতেছে মা-শোয়ে মনে মনে ক্রুর-হাসি হাসিয়া বলিল, জানি। সে নিজেও ইহারই প্রতীক্ষা করিতেছিল।

মা-শোয়ে নীচে আসিতেই বা-থিন উঠিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু তাহার মুখের দিকে চাহিয়া মা-শোয়ের বুকে শেল বিঁধিল। টাকা সে চাহে না, টাকার প্রতি লোভ তাহার কানাকড়ির নাই, কিন্তু সেই টাকার নাম দিয়া কত ভয়ঙ্কর অত্যাচার যে অনুষ্ঠিত হইতে পারে ইহা সে আজ এই দেখিল।

বা-থিন প্রথমে কথা কহিল, বলিল, আজ সাতদিনের শেষ দিন; তোমার টাকা আনিয়াছি।

হায় রে মানুষ মারিতে বসিয়াও দর্প ছাড়িতে চায় না। নইলে, প্রত্যুত্তরে এমন কথা মা-শোয়ের মুখ দিয়া কেমন করিয়া বাহির হইতে পারে যে, সে সামান্য কিছু টাকা প্রার্থনা করে নাই—ঋণের সমস্ত টাকা পরিশোধ করিতে বলিয়াছে।

বা-থিনের টাকা পীড়িত শুষ্ক মুখ হাসিতে ভরিয়া গেল, বলিল, তাই বটে, তোমার সমস্ত টাকাই আনিয়াছি।

সমস্ত টাকা? পেলে কোথায়?

কালই জানিতে পারিবে। ওই বাক্সটায় টাকা আছে, কাহাকেও

গণিয়া লইতে বল।

গাড়োয়ান দ্বারপ্রান্ত হইতে তাহাকে লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আর কত বিলম্ব হইবে। বেলা থাকিতে বাহির হইতে না পারিলে যে পেগুতে রাত্রের মত আশ্রয় মিলিবে না।

মা-শোয়ে গলা বাড়াইয়া দেখিল, পথের উপর বাক্স বিছানা প্রভৃতি বোঝাই দেওয়া গোযান দাঁড়াইয়া। ভয়ে চক্ষের নিমেষে তাহার সমস্ত মুখ বিবর্ণ হইয়া উঠিল, ব্যাকুল হইয়া একেবারে সহস্র প্রশ্ন করিতে লাগিল, পেগুতে কে যাবে?

গাড়ি কার। কোথায় এত টাকা পেলে? চুপ করিয়া আছ কেন? তোমার চোখ অত শুকনো কিসের জন্য? কাল কি জানিব? আজ বলিতে তোমার—

বলিতে বলিতেই সে আত্মবিস্মৃত হইয়া কাছে আসিয়া তাহার হাত ধরিল—এবং নিমেষে হাত ছাড়িয়া দিয়া তাহার ললাট স্পর্শ করিয়া চমকিয়া উঠিল—উঃ, এ যে জ্বর, তাই তে বলি, মুখ অত ফ্যাকাশে কেন?

বা-থিন আপনাকে মুক্ত করিয়া লইয়া শান্ত মৃদু-কণ্ঠে কহিল, ব'সো। বলিয়া সে নিজেই বসিয়া পড়িয়া কহিল, আমি মান্দালে যাত্রা করিয়াছি। আজ তুমি আমার একটা শেষ অনুরোধ শুনিবে?

মা-শোয়ে ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, সে শুনিবে।

বা-থিন একটু স্থির থাকিয়া কহিল, আমার শেষ অনুরোধ, সৎ দেখিয়া কাহাকেও শীঘ্র বিবাহ করিও। এমন অবিবাহিত অবস্থায় আর বেশীদিন থাকিও না। আর একটা কথা—

এই বলিয়া সে আবার কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া এবার আরও মৃদুকণ্ঠে বলিতে লাগিল, আর একটা জিনিস তোমাকে চিরকাল মনে রাখিতে বলি। এই কথাটা কখনও ভুলিবে না যে, লজ্জার

মত অভিমানও স্ত্রীলোকের ভূষণ বটে, কিন্তু বাড়াবাড়ি করিলে—

মা-শোয়ে অধীর হইয়া মাঝখানেই বলিয়া উঠিল, ও-সব আর একদিন শুনিব। টাকা পেলে কোথায়?

বা-থিন হাসিল। কহিল, এ কথা কেন জিজ্ঞাসা কর? আমার কি না তুমি জানো?

টাকা পেলে কোথায়?

বা-থিন ঢোক গিলিয়া ইতস্ততঃ করিয়া অবশেষে কহিল, বাবার ঋণ তাঁর সম্পত্তি দিয়াই শোধ হইয়াছে—নইলে আমার নিজের আর আছে কি?

তোমার ফুলের বাগান?

সে-ও ত বাবার।

তোমার অত বই?

বই লইয়া আর করিব কি? তা ছাড়া সে-ও ত তাঁরই।

মা-শোয়ে একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, যাক, ভালই হইয়াছে। এখন উপরে গিয়া শুইয়া পড়িবে চল।

কিন্তু আজ যে আমাকে যাইতেই হইবে।

এই জ্বর লইয়া? এ কি তুমি সত্যিই বিশ্বাস কর, তোমাকে আমি এই অবস্থায় ছাড়িয়া দিব? এই বলিয়া সে কাছে আসিয়া আবার হাত ধরিল।

এবার বা-থিন বিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল, মা-শোয়ের মুখের চেহারা একমুহূর্তেই একেবারে পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। সে-মুখে বিষাদ, বিদ্বেষ, নিরাশা, লজ্জা, অভিমান—কিছুরই চিহ্নমাত্র নাই, আছে শুধু বিরাট স্নেহ ও তেমনি বিপুল শঙ্কা—এই মুখ তাহাকে একেবারে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া দিল। সে নিঃশব্দে ধীরে ধীরে তাহার পিছনে পিছনে উপরে শয়ন-কক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইল।

তাহাকে শয্যায় শোয়াইয়া দিয়া মা-শোয়ে কাছে বসিল, দুটি

সজল দৃপ্ত চক্ষু তাহার পাণ্ডুর মুখের উপর নিবদ্ধ করিয়া কহিল, তুমি মনে কর, কতকগুলো টাকা আনিয়াছ বলিয়াই আমার ঋণ শোধ হইয়া গেল? মান্দালের কথা ছাড়িয়া দাও, আমার হুকুম ছাড়া এই ঘরের বাহিরে গেলেও আমি ছাদ হইতে নীচে লাফাইয়া পড়িয়া আত্মহত্যা করিব। আমাকে অনেক দুঃখ দিয়াছ, কিন্তু আর দুঃখ কিছুতেই সহিব না, এ তোমাকে আমি নিশ্চয় বলিয়া দিলাম।

বা-থিন আর জবাব দিল না। গায়ের কাপড়টা টানিয়া লইয়া একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল।

॥ সমাপ্ত ॥